Subscribe: Thanks Bharat Youtube Channel
eBook
সর্বশ্রেষ্ঠ কে ?
(৪র্থ অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত)
রাহুল আর্য
অনুবাদক - আশীষ আর্য

৪র্থ অধ্যায়ের বিষয়সূচি:

রাখালদের দেশ

এই অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা পরিস্থিতির উপর ওঠা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার সাথে স্বর্ণিম ইতিহাসের আশ্চর্যজনক জ্ঞান আপনি জানতে পারবেন। এই অধ্যায়কে পড়ে বিশ্বের প্রত্যেক স্থানে বসবাসকারী ব্যাক্তি প্রাচীন সভ্যতার তথা মানবদের উপর অবশ্যই গর্ব করবে। এটা সত্য যে বর্তমানে বেদের জ্ঞান ভারতেই রয়েছে। এই কারণে ভারত দেশকে লক্ষ্য করে অনেক ইতিহাসকার একে রাখালদের দেশ সিদ্ধ করার জন্য ভরপুর চেষ্টা করেছে। শ্রীকৃষ্ণের নাম করে বলা হয় যে, ভারতের রাজাও গরু, মোষ চরাতো। কিছু পক্ষপাতী ইতিহাসকার তো বলে যে, প্রাচীন ভারতীয়দের কোনো জ্ঞানই ছিল না আর তারা নদীর কিনারে গরু চরিয়ে বেদ লিখে ছিল।

এই অধ্যায়কে পড়ে এরকম লোকেরা জানতে পারবে যে, প্রাচীন ভারতীয়দের কোন-কোন জটিল বিদ্যার জ্ঞান ছিল। কিন্তু তার আগে একটি প্রশ্ন এটাও ওঠে যে, গাভী চরানো কি খারাপ? এই লোকেরা এমনটা কেন বলে? কোনো প্রাণীকে প্রতিদিন ভোজন খাওয়ানো, তার রক্ষা করা কি অন্যায়? গাভী চরালেই কাউকে মূর্খ বলে দেওয়াটা কি উচিত? আজ বড়-বড় উদ্যোগপতি, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, রাজনেতা, নিজের-নিজের ফার্ম হাউসে গাভী পালছে আর বিনা ইউরিয়ায় খেতী করে তথা করায়। কেবল এরজন্য যে, তারা যেন দুধ তথা ভোজন শুদ্ধ পেতে পারে। এইসব লোকদেরও কি মূর্খ বলা উচিত কারণ এরা সবাই গাভী, মোষের পালন পোষণ করে? মূর্খতা আর বুদ্ধিমত্তা মাপার কি এটাই পরিমাপ? বাস্তবে ভারতের বিষয়ে এরকম ধারণাকারী ইতিহাসকার নিজের সঙ্কুচিত ভাবনা আর পক্ষপাতী বিচারধারাকে প্রদর্শিত করে।

বহু বছর ধরে দেখে আসছি যে, কিছু লোক প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানকে সর্বোত্তম বলে অপরকে নিচু দেখায় আবার কিছু লোক প্রাচীন ভারতীয় বেদ বিজ্ঞানের উপহাস করে তাকে বেকার বলে দেয়। বাস্তবে মানুষেরা সৃষ্টি থেকে প্রাপ্ত করা বস্তগুলো থেকেই নতুন-নতুন বস্তু বানিয়ে তার উপর নিজের অধিকার বলে মনে করে। কিছু লোকে বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির সামনে নতমস্তক হয়ে বাকি সব ঐতিহাসিক মানবীয় চেষ্টাগুলোকে তুচ্ছ মনে করা শুরু করেছে। তাদের কাছে প্রাচীন মনুষ্য কেবল ভোজনের সন্ধান করে বেড়ানো বনমানুষই ছিল। সুতরাং বিজ্ঞানের বিষয়ে সমাজে অনেক প্রকারের মান্যতা ছড়িয়ে আছে। আমি সবসময় বলি যে, আজ যে বিজ্ঞান উন্নতি করেছে এটা এই সংসার প্রথমবার দেখেনি বরং কোটি-কোটি বর্ষ পূর্বেও মানুষের এরকম উন্নতি অনেকবার দেখে এসেছে। বিজ্ঞান তৈরি হয় আবার ধ্বংস হয়ে যায়। লোক বদলে যায়, ভাষা বদলে যায়, রিলিজিয়ন বদলে যায়, দেশ বদলে যায় কিন্তু সৃষ্টির নিয়ম সর্বদা সেটাই থেকে যায়। সৃষ্টির নিয়মকে জেনেই মানুষ নিজের বুদ্ধি লাগিয়ে অনেক প্রকারের বিজ্ঞানের উন্নতি করে নেয়। কিছু লোক বলে থাকে যে, বিমান জাহাজের আবিষ্কার মানুষের সবথেকে বড় উন্নতি ছিল। তারপর

মানুষ মানবরহিত রকেট দ্বারা চাঁদ তথা মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বাস্তবে গুরুত্বপূর্ণ বিমান জাহাজটি নয় বরং গুরুত্বাকর্ষণ, গতি তথা বলের (force) মতো সৃষ্টির নিয়ম হবে।

এটা সত্য যে সৃষ্টির নিয়মটাই হল সেই চাবি যার দ্বারা বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা তালা খোলা যেতে পারে। সৃষ্টির নিয়মের কর্তা আমাদের প্রত্যেক নিয়মের জ্ঞান কোটি-কোটি বর্ষ পূর্বেই দিয়ে দিয়েছিল তথা তারসঙ্গে মানুষকে বুদ্ধিও দিয়েছিল যেন নিয়মগুলোকে জেনে মানুষ বিজ্ঞানে উন্নতি করতে থাকে। অণু, পরমাণু, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নির মতো পদার্থের গুণ জানার পর মানুষ তার থেকে অনেক লাভদায়ক আশ্চর্যজনক পদার্থ বানিয়ে ফেলেছে।

আজকের মানুষ তথা বৈজ্ঞানিক এই বিজ্ঞানের উন্নতির উপর অহংকারী হয়ে বলে যে, এর পূর্বে এত উন্নতি বিশ্বে কখনও হয়নি অন্যদিকে পৃথ্বী তৈরি হয়ে কোটি-কোটি বছর পেরিয়ে গেছে। আজকের ইতিহাসকার নিজেকে অনেক বড় বিদ্বান মনে করে লেখে যে, ৫০০০ বছর পূর্বে বিশ্বে আদিমানব তথা বনমানুষ থাকতো, যারা ধাতুর জ্ঞ্যানও জানতো না। এই লোকেদের উত্তর দিতে গিয়ে আমি সর্বদা এটাই বলি যে, বিজ্ঞানের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত তথা সৃষ্টির প্রত্যেক নিয়মের উল্লেখ বেদের মধ্যে দেওয়া আছে। সৃষ্টির প্রত্যেক নিয়মের খোঁজের শ্রেয় পূর্বের ৫০০ বছরের হওয়া কিছু ইউরোপীয় বিদ্বানদের দিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু প্রত্যেক নিয়মের জ্ঞান মানুষদের বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন পুস্তক বেদে আগেই দেওয়া রয়েছে।

এই প্রকার বললে পরে কিছু লোকে প্রশ্ন করে বসে যে, ইউরোপের লোকেরা তো বেদ শাস্ত্র পড়েনি, তাহলে তারা কিভাবে বিজ্ঞানে এত উন্নতি করলো? আজকের সময়ে বেদ বিজ্ঞানের কি এমন আবশ্যকতা আছে, এসব ছাড়াই মানুষ মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে? কিছু লোকে বলে দেয় যে, ২১তম শতাব্দীতে বেদবিজ্ঞান হচ্ছে বেকার তথা মানুষদের এখন এটার কোনো আবশ্যকতা নেই। বাস্তবে এটা কেবল বিজ্ঞানের বিষয় নয় বরং ইতিহাসেরও বিষয়। অনেক বড় ঐতিহাসিক তথ্য তথা অনুভবের আধারে এরকম সকল প্রশ্নের প্রমাণিক উত্তর আপনি সরল শব্দে নৈমিত্তিক পদ্ধতিতে বুঝতে পারবেন।

যুদ্ধের এক প্রাচীন পদ্ধতি হল যে, যদি শত্রুর ইতিহাস সমৃদ্ধিশালী তথা গৌরবশালী থাকে তবে তাকে নষ্ট করে দাও। এর সোজা সিদ্ধান্ত হল যে - "By half truths break old moral virtues, honesty, valor and earnestly." বড়-বড় ইউনিভার্সিটিতে বসা প্রফেসর নিজেরই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি যুবকদের মোহ ভঙ্গ করার চেষ্টা করে থাকে।

এই লোকেদের আরও একটি সিদ্ধান্ত আছে যে, স্বয়ং উত্তর দেওয়ার চক্করে যাবে না তথা অন্যের প্রশ্ন শেষ হতে না দেওয়া। এর অর্থ হল এই যে, এইসব লোক উত্তর দিতে নয় বরং নতুন-নতুন প্রশ্ন তুলে ধরে উত্তর

চাওয়াতে বিশ্বাসী। এইরকম প্রফেসর দেশের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম আদি থেকে লোকেদের শ্রদ্ধা সরিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন-নতুন প্রশ্ন তুলতে থাকে। এই অধ্যায়ে এইসব সমস্যার শিকড়কেই গোড়া থেকে কেটে ফেলা হবে।

বিনা বেদ জ্ঞানে বিশ্ব কিভাবে বৈজ্ঞানিক উন্নতি করেছে?

এটা সর্ববিদিত যে, বেদ হল বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন পুস্তক। এতক্ষণ পর্যন্ত বিষয় পড়ে আপনি এটাও জেনে থাকবেন যে, বেদের মধ্যে জ্ঞান - বিজ্ঞানের সেই সব রহস্যের কথা লেখা রয়েছে যাকে আজ বৈজ্ঞানিক খুঁজে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন এটা উঠছে যে, যেসব দেশে বেদ নেই সেখানে এত উন্নতি কিভাবে হয়েছে? সুতরাং আজ বিশ্বে বেদের মতো মানব ধর্মশাস্ত্রের কি এমন আবশ্যকতা রয়েছে?

যদি জ্ঞানকে দুই প্রকারে বিভাজন করা হয় তবে আধ্যাত্মিক আর ভৌতিক জ্ঞান বলা যেতে পারে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্তর্গত সৃষ্টির রচয়িতা আর শরীরে উপস্থিত জীবাত্মা হতে সম্বন্ধিত জ্ঞান আসবে, অন্যদিকে সাংসারিক পদার্থের বিষয়গুলোকে জানা ভৌতিক জ্ঞানের অন্তর্গত হবে। মানব সমাজকে শান্তি-সমৃদ্ধির জন্য উভয় প্রকারের জ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি সমাজে মানবীয় গুণগুলোকে বাড়ায়। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ভৌতিক উন্নতি করাটা প্রাণীমাত্রের জন্য হিতকর হয়ে থাকে। যদি সমাজে আধ্যাত্মিকতার অবনতি (পতন) হয়ে যায় আর ভৌতিক উন্নতি চরমে পৌঁছে যায় তবে বিনাশকারী বিচারের আর অমানবীয় গুণের সমাজ হয়ে যাবে। এরকম সমাজ বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়াবে যেটি যেকোনো সময় নষ্ট হতে পারে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবে ভৌতিক জ্ঞানের দুরুপয়োগ হয়ে থাকে। আজ মানুষ ভৌতিক জ্ঞানে অনেক উন্নতি করেছে কিন্তু ভাবুন এই ২০০-৩০০ বছরের মধ্যে এই বিশ্বকে বিজ্ঞান কত বিনাশ করেছে।

এখন পর্যন্ত অধ্যায় পড়ে আপনি এটা তো বুঝেই গেছেন যে, মানুষের শিশুকে না শেখালে স্বয়ং নিজে থেকে কিছু শেখে না। যদি তাকে কেউ কিছু না শেখায় তবে সে তার আস-পাশে উপস্থিত পশু-পাখি আদিকে দেখে তাদের মতোই শিখে নেয়। তাদের না শেখালে তারা সেই বাঁদর আদির মতো হবে যারা মানুষ আদিকে দেখে তাদের মতো (নকলই) করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু মানুষ আর বাঁদরের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে যে, মানুষের কাছে অনেক অধিক জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য বুদ্ধি রয়েছে আর বাঁদর আদি পশুদের কাছে জীবিত থাকার যত জ্ঞানের আবশ্যকতা ততখানি স্বাভাবিক জ্ঞান রয়েছে। যদি কেউ বাঁদরকে কাপড় সেলাই কারী সুই বানানো অথবা অন্য কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয় তবে সে কখনই

মানুষের মতো শিখতে পারবে না। এর অর্থ হল যে, মানুষ সৃষ্টির আদি হতেই বুদ্ধিমান আর প্রারম্ভে যখন সর্বপ্রথম ঈশ্বর মানুষদের উৎপন্ন করে তো তখন তাকে জ্ঞানও দিয়েছিল। সেই প্রারম্ভিক জ্ঞানকে মানব ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ বলা হয়, যার মানে হল জ্ঞান। তারপর এক প্রজন্ম থেকে দ্বিতীয় প্রজন্ম, একস্থান থেকে অন্যস্থান পর্যন্ত সেই জ্ঞান মানুষ ছড়াতে থাকে। তারপর সেই বিদ্যা বেদ ছাড়াই সংসারে ছড়িয়ে যায়।

আজকে যে ব্যক্তি এটা বলছে যে, বিজ্ঞান অনেক উন্নতি করে ফেলেছে সেসব ব্যাক্তি নিতান্ত অহংকারী আর নিজের হতে পূর্বের লোকেদের পুরুষার্থকে নীচ বলে মনে করে। আজ যেসব বিজ্ঞানকে আপনি সংসারের মাঝে দেখছেন তা এখানে পর্যন্ত কোনো ১০০-৫০০ বছরে মধ্যে আসেনি। এই ছোট-ছোট বিদ্যাগুলোকে শিখতে থাকার দরুন সম্পূর্ণ মানবজাতিকে সহস্র লক্ষ-লক্ষ বছরের কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে এটা তারই ফল। আজ বিজ্ঞানের উন্নতিকে দেখে লোকে ভুলে যায় যে, সৃষ্টির আদিতে মানব ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ বেদ থেকেই মানুষ জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিল। আজ পৃথ্বীর প্রত্যেক পদার্থ , প্রত্যেক স্থান এমনকি মানুষও বিষাক্ত হয়ে গেছে। ভৌতিক জ্ঞানে এই বিশ্ব এতই উন্নতি করে ফেলেছে যে, বিশ্বে অর্ধেকের বেশি জনগণ পান করার জল পাচ্ছে না আর প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ লোক ক্ষুধার্তে যন্ত্রণায় মারা যায়।

প্রথমে ভৌতিক বিজ্ঞানেরই বিচার ধরা যাক, সাংসারিক পদার্থের জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানের দুইভাবে উন্নতি করা যেতে পারে।

• প্রথমত, মানব ধর্মগ্রন্থ বেদকে পড়ে আর বুঝে নিয়ে বিজ্ঞানে উন্নতি করা যেতে পারে। বেদের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞান যথা সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, চাঁদে জীবন, আকাশগঙ্গার, বর্ষা বিজ্ঞান আদি বিভিন্ন বিষয়গুলোকে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। তীব্র গতিতে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলার সাধন বানানোর অনেক মন্ত্র রয়েছে। এই সাধনগুলোর মধ্যে বায়ুতে চলনকারী বিমানগুলো বানানোর বিদ্যাও রয়েছে। বিদ্যুৎ বানানোর বিদ্যা থেকে অণু-পরমাণু পর্যন্ত সকল প্রকারের বিদ্যা বেদের মধ্যে দেওয়া আছে। কিন্তু এইসব সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত রূপে দেওয়া হয়েছে। যদি বিস্তারে বেদের এক-একটি বিদ্যাকে উন্নত করার জ্ঞান দেওয়া হত তাহলে বেদের আকার এত বড় হত যে মানুষ তাকে সামলাতেই পারতো না। দ্বিতীয় কথা, যদি প্রত্যেক বিষয়ের উপর এক-একটি কথা গভীর ভাবে শেখানো হত তবে মানুষের বুদ্ধির প্রয়োগ কি করতে?

বিদ্যালয় আদিতে গণিতের পুস্তকে সিদ্ধান্ত (ফর্মুলা) দেওয়া হয়। সেই ফর্মুলা প্রয়োগ করে লক্ষ-লক্ষ প্রশ্নের উত্তর সরলতার সঙ্গে বের করা যেতে পারে। এমনটা নয় যে, লক্ষ প্রশ্ন আর উত্তর দ্বারা গণিত পুস্তককে লক্ষ পৃষ্ঠার বানানো হবে। এইভাবে বেদের মধ্যেও সিদ্ধান্ত রূপে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

• দ্বিতীয়ত, সংসারের পদার্থগুলোকে দেখে বুঝে নিয়েও ভৌতিক উন্নতি প্রাপ্ত করা যেতে পারে। এতে সময় অনেক লাগবে যেমন বেদকে পড়ে অগ্নির গুণগুলোকে সরলতার সঙ্গে জানা যেতে পারে যে অগ্নি তীক্ষ্ণ হয় আর অগ্নি দ্বারা বিভিন্ন কার্য সিদ্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু বেদ ছাড়াও মানুষ এই জ্ঞান ঈশ্বরের বানানো সৃষ্টির অধ্যয়ন করে প্রাপ্ত করতে পারে। অগ্নির নিকট গিয়ে কেউ অগ্নির গুণগুলোকে জানতে পারবে কিন্তু তার প্রয়োগগুলোকে জানার জন্য অনেক সময় লেগে যাবে। সুতরাং ভৌতিক জ্ঞান বেদ হতে কিংবা সৃষ্টির অধ্যয়ন হতে প্রাপ্ত করা যেতে পারে। এমনটা নয় যে, যিনি বেদ পড়েননি তার জ্ঞানই হবে না বরং বেদের জ্ঞান দাতা ঈশ্বরের বানানো সৃষ্টিকে দেখে ঈশ্বরের দেওয়া বুদ্ধির বলের উপরেও জ্ঞান প্রাপ্ত করা যেতে পারে। কিন্তু সে জ্ঞান ভ্রান্তিকারক হবে কারণ সৃষ্টি আদিকে দেখে কেবল ভৌতিক জ্ঞানে উন্নতি করা যেতে পারে, আধ্যাত্মিকে নয়। যেখানে ভৌতিক জ্ঞান সমাপ্ত হয়ে যায় সেখান থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রারম্ভ হয়। যেরকম শরীর তথা প্রাণ উভয়ই জীবনের জন্য আবশ্যক ঠিক সেইরকম ভৌতিক তথা আধ্যাত্ম জ্ঞান উভয় জ্ঞানই সংসারের জন্য আবশ্যক। আধ্যাত্ম জ্ঞান ছাড়া ভৌতিক জ্ঞান বিনাশকারী হয়ে থাকে তথা দীর্ঘকাল পর্যন্তও চলতে পারে না।

সজ্জনগণ! উন্নতির সঙ্গে অবনতি অর্থাৎ উত্থানের সঙ্গে পতন অবশ্যই হয়ে থাকে। যেদিন থেকে আপনি ঘর বানানো শুরু করেছেন সেদিন থেকেই সেই ঘর ভাঙ্গাও শুরু হয়ে যায়। অণু পরমাণুর মিশ্রণে বানানো যেকোনো পদার্থ সর্বদা থাকে না। ঠিক এইভাবে সভ্যতা তৈরি হয় এবং ধ্বংস হয়ে থাকে। আগে যেতে থাকে আর উন্নতি করতে থাকে। তারপর কোনো না কোনো কারণে সমাপ্ত হয়ে যায় আর আবারও নতুন সভ্যতা আর আবারও তার পতন এই প্রবাহ নিরন্তর চলতে থাকে। সুতরাং এটা প্রথমবার নয় যে, মানুষ এত ভৌতিক উন্নতি প্রাপ্ত করে ফেলেছে। এমনটা বলা আজকের মানুষদের মিথ্যা অহংকার দর্শাচ্ছে।

এখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আসি, এই জ্ঞান ভৌতিক জ্ঞানের অপেক্ষায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। জীবাত্মা আর ঈশ্বর হল ভৌতিক পদার্থের থেকেও সূক্ষ্ম সুতরাং তাদের জ্ঞান কোনো মেশিন অথবা কোনো ফর্মুলা দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। এই সাধারণ কথাটাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যারা নিজেকে বৈজ্ঞানিক বলে, তারা জানেই না। এইজন্য সৃষ্টির রচয়িতা আর তার শক্তিকে খোঁজার জন্য কয়েক আরব ডলার ব্যয় করে বৈজ্ঞানিকরা এক খুবই বিশালকায় এল০ এচ০ সী০ মেশিনের নির্মাণ করে। সন ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ করতে থাকে কিন্তু কোনো পরিণাম বের হয় না। এখন বিশ্বের অপার ধন লেগেছে তাই সংসারের সামনে কিছু না কিছু কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ৩০ কিলোমিটার লম্বা মেশিন দ্বারা বিশ্বের সবথেকে সূক্ষ্ম তত্বকে সন্ধানকারী ভুলে গেছে যে, সেই তত্বটা সর্বব্যাপক আর সেটা মেশিনেরও অণু-পরমাণুতে রয়েছে। যদি সেই তত্ব কোনো পদার্থ দ্বারা তৈরী হত তবে নিশ্চিত রূপে তাকে বিজ্ঞানের সহায়তায় তৈরি কোনো সাধন দ্বারা খোঁজা যেত, যেমন প্রোটন ইলেকট্রন আদিকে জানতে পারা গেছে। কিন্তু যেটি কোনো কিছু দ্বারা তৈরি নয় আর সংসারের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম পদার্থ থেকেও অসংখ্য গুন সূক্ষ্ম, তাই তাকে ভৌতিক বিজ্ঞান দ্বারা জানা

অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, ঈশ্বর স্বয়ংই তার কাছে পৌঁছানোর জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম তত্ব (বুদ্ধি) বানিয়ে জীবাত্মার উপর কৃপা করেছে। অষ্টাঙ্গয়োগের দ্বারা বুদ্ধি আদির সহায়তায় আমরা স্বয়ংকে (আত্মাকে) জেনে যাই আর তার দ্বারা জীবাত্মাই পরমাত্মার অনুভব করতে পারে। এর অতিরিক্ত সৃষ্টির রচয়িতা পর্যন্ত পৌঁছানোর আর অন্য কোনো মার্গ নেই। সুতরাং বর্তমান ভৌতিক জ্ঞান মানুষকে বিনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য কোনো স্থান নেই। আধ্যাত্মিক জ্ঞানই (ঈশ্বর আর আত্মাই) মানুষকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারবে। মানুষের জ্ঞান পিপাসা আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারাই পূর্ণ হওয়া সম্ভব।

ভাবুন, যদি সংসারের পদার্থে এত সুন্দরতা ও সুখ আজ মানুষ দেখছে তবে তার রচয়িতার মধ্যে কতই না সুখ হবে? ভাবুন, যে জীবাত্মা মানুষ শরীর পেয়ে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের আশ্চর্যজনক পদার্থকে বানিয়ে ফেলে, সেই জীবাত্মাকে জানাটা সংসারের কত বড় আশ্চর্য হবে? যেসব লোকে এটা বলছে যে, বেদ ছাড়াই মানুষ আজ এত উন্নতি করে ফেলেছে, তাহলে নিশ্চতরূপে তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঠিক পরিভাষাকে জানার আবশ্যকতা রয়েছে। এটা সম্ভব যে যেমন-তেমন করে হাজার-হাজার বছর পর্যন্ত পুরুষার্থ করে আর সৃষ্টির অধ্যয়ন করে মানব সমাজ ভৌতিক জ্ঞানে উন্নতি করতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর ভৌতিক জ্ঞান একসঙ্গে প্রাপ্ত করতে হলে মানুষকে মানব ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ বেদের দিকে ফিরে আসতেই হবে।

পরমাণু বিদ্যার জনক মহর্ষি কণাদ লিখেছেন যে, **"য়তো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি সহ ধর্মঃ"** অর্থাৎ যে বিদ্যার দ্বারা সংসারের সকল পদার্থের সঙ্গে-সঙ্গে ঈশ্বর-আত্মা আদিরও জ্ঞান হবে, তাকে ধর্ম বলে।

সুতরাং এমনটা নয় যে, মানুষ বেদের জ্ঞান ছাড়া উন্নতি করতে পারবে না। ঈশ্বর মানুষকে বুদ্ধি তত্ব দিয়েছে যারদ্বারা মানুষ প্রত্যেক পদার্থের অধ্যয়ন, পরিমাপ আর বিশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু যেখানে ভৌতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাপ্ত হয়ে যায় তার পরের বিদ্যা কেবল বেদ দ্বারাই মানুষ জানতে পারবে। যেরকম বেঁচে থাকার জন্য ভোজন তথা জলের সঙ্গে-সঙ্গে বায়ু আদিরও আবশ্যকতা রয়েছে, এরকমই ভৌতিক জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেরও আবশ্যকতা সর্বদা রয়েছে। যেদিন সংসারে এই উভয় জ্ঞান সর্বসাধারণের মাঝে পৌঁছে যাবে সেদিন লোকের মন ভোলানোর জন্য কোনো জন্নত আদির লোভ, পাপমুক্তি আর যিশুর প্রাপ্তি আদি লোভের আবশ্যকতা হবে না। সমাজ কর্মফল ব্যবস্থার অনুসারে শান্তি আর সমৃদ্ধি প্রাপ্ত করবে।

বর্তমান বিজ্ঞানের অহংকার:

আমি মনে করি যে, বিজ্ঞান কখনও আমার-তোমার বলে হয় না। কিন্তু অহংকারে ডোবা কিছু লোক প্রশ্ন তোলে যে, বৈদিক আর্য লোকেরা কেবল গরু-মোষ চরানোই জানতো। ভারতের লোকেদের অপমান করার জন্য মূর্খতাপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। কিছু এরকমই প্রশ্নের উপর প্রকাশ দিয়ে সংক্ষেপে ভারত হতে ছড়িয়ে যাওয়া বিশ্ব সভ্যতার দিকদর্শন করবো।

📒প্রশ্ন - যদি ভারতে সর্ব প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞান আগে থেকেই ছিল তবে তা সমাপ্ত কিভাবে হয়েছে?
উত্তর - আজ নাসার মতো কিছু এজেন্সি বিজ্ঞানের উন্নতিতে নিজের পিঠ থপথপাচ্ছে। বিশ্বের দেশগুলোতে শ্রেয় নেওয়ার ভিড় লেগে গেছে যে, এই বিজ্ঞান আমরা করেছি সেই বিজ্ঞান আমরা করেছি। বিজ্ঞান কখনও আমার তোমার হয় না কিন্তু সকলের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে। যারাই সংসারের উত্থানের জন্য পুরুষার্থ করেছে তাদের জন্য জয় জয়কার হওয়াই উচিত। এটাও সত্য যে, পরবর্তী কালে নাসা ও অন্য দেশের বৈজ্ঞানিকরা দিন-রাত পরিশ্রম করে বিদ্যার বিস্তার করেছে। এই কার্যের জন্য তারা সকলেই প্রশংসার পাত্র। অস্তু, উত্থানের সঙ্গে পতন জুড়ে রয়েছে। প্রচেষ্টা আর পুরুষার্থ যেখানেই হবে সেখানে উন্নতি অবশ্যই হবে। উন্নতির সময়ে অপার ধন সম্পদা, শক্তি, আনন্দ ফুর্তির সাধন তৈরি হয়ে যায়। তারপর সেসবের কারণে আলস্য আর প্রমাদ বেড়ে যাওয়ায় অবনতি ঘটে। যেমনটা মহাভারত যুদ্ধের পর য়দু বংশীদের, বৃষ্ণী বংশীদের তথা অন্ধক বংশীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় পতন হয়েছিল। এই প্রকারে ইউরোপের দেশগুলো আর আমেরিকা আদির লোক এখন আগের মতো তেমন পুরুষার্থী নয় যতটা ভারত আর চিন আদি দেশের লোক হয়ে গেছে। এইজন্য সকলে মেনে নিয়েছে যে, ২১ তম শতাব্দীর বিশ্বশক্তি এশিয়াতে হবে। যেভাবে মানুষ প্রথমে শিশু থাকে তারপর যুবক আর শেষে বৃদ্ধ হয়ে সমাপ্ত হয়ে যায় ঠিক সেভাবেই সভ্যতা তৈরি হয় আর ধ্বংস হয়ে থাকে। ব্যবস্থাও পরিবর্তন হতে থাকে। মহাভারত যুদ্ধ সমস্ত বিশ্বের ব্যবস্থাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। সম্পূর্ণ বিশ্বের বিদ্বান শিল্পী যুদ্ধের কারণে কালের গ্রাসে চলে গিয়েছিল। কিছু সুন্দর কবিতায় বুঝুন -

শক্তি, সমর্থ, সেবা সদা সংসারে থাকে না,
আজ সেটা আছে যেখানে, কাল ছিল অন্য কোথাও,
এটাও এক যাত্রা ছিল, সেটাও এক যাত্রাই ছিল।।

📒প্রশ্ন - যদি লক্ষ বছর পূর্বেও সংসারে বিজ্ঞান ছিল তবে তার অবশেষ উপলব্ধ নেই কেন?
উত্তর - এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে যে, যদি সংসার এর পূর্বেও উন্নতি করেছিল তবে তার কিছু অবশেষ, চিহ্ন, উদাহরণ আদি প্রাপ্ত হওয়া উচিত কিন্তু এমনটা সংসারে হচ্ছে না। যারা ইতিহাস বিদ্যাকে গভীরভাবে পড়েছে তারা জানে যে, হাজার বা লক্ষ বছর পূর্বের অবশেষ না পাওয়ার অনেক ধরনের কারণ থাকে।

• হাজার-হাজার বছরের অনেক পদার্থই ক্ষয় (গলা) প্রাপ্ত হয়ে যায়। বংশজরা নিজের পূর্বজের বস্তুগুলোকে প্রয়োগ করে যেতে থাকে। আজও নিজের পিতা, দাদার বস্তু তাদের সন্তান উপযোগ করে থাকে। এই দুই কারণে ইতিহাস থেকে মুছে যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা গৃহযুদ্ধ অথবা বহিরাগত আক্রমণকারীর কারণেও সভ্যতা ইতিহাস থেকে মুছে যায়। গ্রন্থ ও সাহিত্যে স্বার্থী লোকে বিভিন্ন দেশ, কাল, পরিস্থিতির মধ্যে মিশ্রণ করতে থাকে যার কারণে তাদের ঐতিহাসিকতা নষ্ট হয়ে যায়।

যেমন রামায়ণ, মহাভারতের মতো ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে বড় স্তরে কাল্পনিক কাহিনী তথা শ্লোকগুলো স্থান নিয়ে ফেলেছে তাই বিশ্ব সমুদয় সেই সঠিক ইতিহাসের গ্রন্থকেই কাল্পনিক ঘোষণা করে দিয়েছে। এটা তো এমন কথা হয়ে গেল যে, ব্যথা আছে চোখে তাই চোখকেই তুলে নাও, দাঁতে ব্যথা তবে দাঁতকেই উখরে নাও, হাতে ব্যথা তাহলে হাতকেই কেটে ফেলো।

যদি ইতিহাসবিদ্ এইভাবে পক্ষপাতপূর্ণ উপায়ে ইতিহাসের নির্মাণ করা শুরু করে লোকদের পড়ায় তবে এক দিন সম্পূর্ণ মানবজাতির বেঁচে থাকা ইতিহাসও সমাপ্ত হয়ে যাবে। যারা বলছে যে, কোনো সমস্যা নেই ইতিহাস সমাপ্ত হয়ে গেলে ভালোই হবে তারা সবার থেকে বেশি মোবাইলে ছবি (ফটো, ভিডিও) আদি বানিয়ে স্মৃতিকে সংগ্রহীত করে রাখে। যদি ইতিহাস নেই তবে মানুষও নেই। যা আপনি আগে কখনও বিদ্যালয়ে, ভ্রমণে, বয়স্কদের কাছ থেকে, পুস্তক থেকে, অন্যদের দেখে যা যা শিখেছেন আদি সেসব ইতিহাস হয়ে যায়। কিন্তু আপনি প্রতিদিন সেই ইতিহাস থেকে শেখা বিদ্যা হতে নিজের জীবন চালিয়ে যেতে থাকেন। এই কথাকে বুঝতে হলে কিছু বুদ্ধির আবশ্যকতা পড়বে।

• ইতিহাস নষ্ট হওয়ার আরও একটা বড় কারণ হল, ইতিহাসের উপর শোধকর্তা ব্যক্তিরাই সভ্যতার অবশেষ (বেঁচে থাকা পদার্থ আদি) বের করে নেয়। তারপর তারথেকে নিজের-নিজের অনুসারে লাভ নেওয়ার জন্য নতুন-নতুন পরিভাষা বানায় আর সম্পূর্ণ ইতিহাস বিকৃত হয়ে যায়। ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে উপস্থিত রাজাদের চাপেও ইতিহাসকে তাদের ভালো অনুসারে বানানো হয়ে থাকে। এসব থেকেও পরবর্তী প্রজন্মদের কাছে অবশেষ প্রাপ্ত হয় না, ইত্যাদি ধরনের অনেক কারণ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন ব্রিটিশ ভারতে রেলওয়ে লাইন বিছাচ্ছিল তখন হরপ্পা সভ্যতার ইটগুলোকে তুলে-তুলে রেলওয়েতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্থান ও ভারতের যে যে স্থানের উপর হরপ্পা সভ্যতার বড়-বড় মহল, পুকুর আদি বানানো ছিল তাদের ইটগুলোকে নিয়ে লোকেরা নিজেদের ঘর বানিয়ে নেয়। আজও হরপ্পার অনেক রকমের অবশেষ বেঁচে আছে যাকে স্থানীয় লোকেরা ঘিরে রেখেছে। কিছু অবশেষকে তুলে নিয়ে ইতিহাসের উপর শোধকর্তা বড়-বড় নগরে সংগ্রহালয়গুলোতে প্রদর্শন হেতু রেখে দিয়েছে। প্রায় ২৫০০-২০০০ খৃ০পূর্বের

মহান সভ্যতার নাম-চিহ্ন মেটানো হচ্ছে। তারপর ১০০০ বছর পরে পরবর্তী প্রজন্মেরা বলবে, কোনো হরপ্পা সভ্যতা ছিল না কারণ তার কোনো অবশেষ নেই।

হাজার-হাজার বছরের কথা ছাড়ুন যদি আমরা মরুস্থলে যে স্থান থেকে চলে যাই সেই স্থানে ১ ঘন্টা পশ্চাৎ এসে নিজের পায়ের চিহ্নকে খোঁজা শুরু করি তাহলে তার চিহ্নও আমরা খুঁজে পাই না। এক সময় আসবে যখন সংসারে ভয়ানক মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা পরমাণু যুদ্ধ দ্বারা কোটি-কোটি লোক নষ্ট হয়ে যাবে। সব সরকার সমাপ্ত হয়ে যাবে। সব সাধন-সংসাধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেউ কাজ করার থাকবে না। যেসব লোক কখনও কম্পিউটারে বসে বিলাসিতা পূর্ণ (অপার ধন কমানো) জীবন যাপন করছে তারা সেসময় ভোজনের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে মরবে। মানুষের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল অস্তিত্বের রক্ষা। খিদে পেলে বিমান জাহাজের টুকরো খাওয়া সম্ভব নয়। সেই ভয়ংকর স্থিতিতে দুই-তিন প্রজন্ম হয়তো এমনিতেই বেঁচে থাকার হেতু যাযাবর হয়ে আর সংঘর্ষ করতে-করতে বেরিয়ে যাবে। তারপর পরবর্তী প্রজন্মদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছুই জানা থাকবে না। এই রকমই সভ্যতার মধ্যে উন্নতি-অবনতি চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মহাপ্রলয় আসে।

যারা এর মাঝে সৃষ্টি সমাপ্ত হওয়ার অনুমান লাগিয়ে থাকে, তাদের জানা উচিত যে, এই সংসার ২ আরবের থেকেও অধিক বছর পর্যন্ত সমাপ্ত হবে না। স্বর্ণিম ইতিহাসের সহস্র প্রমাণ তো আমি স্বয়ং Thanks Bharat YouTube Channel দ্বারা অনেক ভিডিওগুলোতে দিয়েছি। ভবিষ্যতে সময় পেলে তবে মহাভারত হতে এখন পর্যন্ত ইতিহাসের উপর লেখা অবশ্যই চালাবো। এখন যদি কেউ এই প্রশ্ন তোলে তবে বুঝে নিবেন যে, সে কোনো না কোনো স্বার্থ, পূর্বাগ্রহ, জিদের শিকার অথবা কোনো দুর্ঘটনার কারণে তার মস্তিষ্ক এরকম গভীর বিষয়কে ধরতে অসমর্থ রয়েছে।

বর্তমান বিজ্ঞানের শ্রেয়:

যদিও বর্তমান বিজ্ঞানে বিশ্বের সকল দেশ তার নিজের-নিজের যোগদান দিয়েছে, তবুও কিছু দেশ আর সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেয় নেওয়ার জন্য তীব্র ইচ্ছা হয়ে থাকে। বিজ্ঞান এখানে পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য অনেক লম্বা যাত্রা করেছে কিন্তু শেষ ১০০ বছরে বিজ্ঞান আশ্চর্যজনক রূপে বৃদ্ধি করেছে। এই ১০০ বছরের এক ঝলক আমি আপনাদের দেখাতে চাই যাতে করে আপনি বুঝতে পারেন যে, বর্তমান বিজ্ঞানের প্রবাহ কোন দিশাতে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর জার্মানী:

যুদ্ধের সময় সর্বদাই বিরোধী পক্ষের লক্ষ্য সেনাপতি, বিদ্বান, শিল্পী তথা বৈজ্ঞানিকরাই হয়ে থাকে। জার্মান ইঞ্জিনিয়র বর্নহর বান ব্রান বিশ্বের প্রথম মিসাইল বানানোর জন্য পেনমুন্ডে নামক গ্রামকে বেছে নিয়েছিলেন। সন ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত ১২ হাজার লোকের সঙ্গে তিনি এই মিশনে লেগে থাকেন। এডোল্ফ হিটলার এই মিশনের উপর বিশেষ ধ্যান দিয়েছিলেন তথা অনেক ধন লাগিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার পরেও সহযোগী বৈজ্ঞানিক বাল্টর ডার্নবর্গরের ১৯৪২তে লেখা গুরুত্বপূর্ণ দলিল আজও উপলব্ধ রয়েছে, যেখানে বিশ্বের প্রথম রকেটর এগ্রিগেট-৪ (A4) এর সফল পরীক্ষণের উল্লেখ রয়েছে। বিশ্বের প্রথম দীর্ঘ দূরত্ব পর্যন্ত মারতে পারা রকেটের নাম "বেঞ্জিয়ন্স" অথবা প্রতিশোধ নেওয়ার অস্ত্র ছিল। এর সম্বন্ধিত দলিল Thanks Bharat Trust এর সঙ্গে সম্পর্ক করে প্রাপ্ত করা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন হিটলার এই অস্ত্রের প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত করছিল সেই সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দা এজেন্সি পেনমুন্ডের রকেট কারখানার খোঁজ পেয়ে যায়। ১৭ আগস্ট ১৯৪৩ তে ব্রিটিশ রয়েল এয়ারফোর্স সেই সময়ের সবথেকে বড় হামলা পেনমুন্ডের উপর করেছিল। ব্রিটেন একে "হাইড্রা" নাম দিয়েছিল। এরপর হিটলার কারখানাটি বদলিয়ে জার্মানির মাঝখানে অবস্থিত মিটেলবর্কে লাগিয়ে দেয়। জার্মানির পরাজয়ের ঠিক পূর্বে যদিও এখনও v1 আর v2 রকেটের কাজ চলছিল কিন্তু তবুও ২৫০০টি V1 আর ১৪০০টি V2 রকেট ব্রিটেনের উপর ছোড়া হয়েছিল যেকারণে প্রায় ৩০০০ লোক মরে যায়। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও সৈনিকরা এইরকম হাওয়াই মেশিন দ্বারা হওয়া হামলাকে দেখে হতবম্ব হয়ে গিয়েছিল।

জার্মানীর বিজ্ঞানকে চুরি করে নিজের বানানোর প্রতিযোগিতা

চতুর্দিক থেকে যুদ্ধে ঘেরা জার্মানী কারখানাগুলোকে বদলাতে ব্যস্ত থাকে আর মিত্র দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জিতে যায়। যদি নাজীর লোকেরা ১-২ বছর সময় আরও পেয়ে যেত তবে যুদ্ধের পরিণামটা অন্য কিছুই হত। যুদ্ধের পশ্চাৎ আমেরিকা, সোভিয়েত সংঘ, ব্রিটেন তথা ফ্রান্সের মতো বিজেতা দেশগুলো A4/V2 টেকনিক অর্জন করার জন্য জার্মান বৈজ্ঞানিক আর ইঞ্জিনিয়ারদের খোঁজা শুরু করে দেয়। বান ব্রানের নেতৃত্বে সকল ইঞ্জিনিয়ার ভিন্ন-ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়, যাতে কোনো এক গ্রুপকে হত্যা করলে

তবে রকেটের টেকনিক যেন সমাপ্ত না হয়ে যায়। রকেটের সম্বন্ধিত সকল ডকুমেন্টস আর সম্পূর্ণ প্রযুক্তিকে ইনি জার্মানী, অস্ট্রিয়া আদির বর্ডারের পাহাড়ে তথা গুফাতে লুকিয়ে রাখেন। এখন এই ইঞ্জিনিয়ার কিছু সুরক্ষিত ছিলেন কারণ যতক্ষণ টেকনিক পাওয়া যাবে না ততক্ষন কোনো দেশই এরকম জ্ঞানী ব্যক্তিদের হত্যা করবে না। পরবর্তীতে প্রযুক্তির কিছু কিছু ব্লু-প্রিন্ট সোভিয়েত সংঘ, ব্রিটেন ও ফ্রান্স পেয়ে যায়। এইজন্য এই দেশগুলো ফাইটার জাহাজের ও স্পেস এজেন্সির দিক দিয়ে উন্নত আজ। সবথেকে বড় লাভ আমেরিকার হয়। মুখ্য বৈজ্ঞানিক বর্নহর বান ব্রান এদের হাতে চলে আসে যাকে আমেরিকা নিজের নাগরিকতা দিয়ে দেয়। ব্রান প্রায় ১৫০ রকেট ইঞ্জিনিয়ারের ঠিকানা জানিয়ে তাদেরও আমেরিকাতে নিয়ে আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর ব্রানের মুখ্য সাথী বাল্টর ডার্নবর্গরও আমেরিকার মহাকাশ মিশনের দায়িত্ব সামলে ছিলেন। ১৯৫৮তে নাসার (NASA) স্থাপনের পরে এরকম বৈজ্ঞানিকরাই নাসার প্রসিদ্ধ মিশন "অ্যাপোলো" -র জন্য কাজ করে ও আমেরিকান মহাকাশ যাত্রীরা চাঁদ পর্যন্ত যাত্রা করে। এই রিসার্চের আধারের উপর এন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল বিকশিত করা হয়।

নাসার (NASA) সফলতার পিছনে জার্মান বৈজ্ঞানিকদের সবথেকে বড় হাত ছিল। সোভিয়েত সংঘ (Soviet Space Program) যখন সকল রকেট বৈজ্ঞানিকদের আমেরিকাতে থাকার কথা শোনে তখন রকেট টেকনিক প্রাপ্ত করার জন্য তারা দিন-রাত, আকাশ-পাতাল এক করে দেয়। সোভিয়েত সংঘের বৈজ্ঞানিক পেনমুন্ডে গ্রামে আসে আর ভাগ্যক্রমে Alexei Isaev নামক বৈজ্ঞানিক Supersonic Bomber Rocket - এর সম্বন্ধিত এক দলিল পেয়ে যান তথা V2 রকেটের বিক্ষিপ্ত কিছু ভাগও পেয়ে যান। শুধু এটাই নয়, এক V2 রকেট যা নাজীরা পোল্যান্ডে অবতরণ করেছিল তাকেও খুঁজে পায়। এখান থেকেই সোভিয়েত সংঘ আর আমেরিকার মহাকাশ উড়ান শুরু হয়। এতেই শেষ নয়, Nuclear Weapons এর খোঁজও হিটলারেরই ছিল আর তারই বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম এই দিশায় কাজ করছিল।

১৯৪৪শে জার্মানীর পরাজয়ের পর রকেট টেকনিকের মতো পরমাণু টেকনিক এবং বৈজ্ঞানিকও আমেরিকার হাতে এসে যায়। "A discovery by nuclear physicists in a laboratory in Berlin, Germany, in 1938 made the first atomic bomb possible, after Otto Hahn, Lise Meitner and Fritz Strassman discovered nuclear fission. When an atom of radioactive material splits into lighter atoms, there's a sudden, powerful release of energy."

যেই গুপ্ত মিশনের উপর হিটলার কাজ করছিল সেখানে অধিকাংশ কারিগর ও মজদুর ইহূদী যুদ্ধবন্ধীরা ছিল। এইজন্য ইহূদী লোকেদের মধ্যেও সেই বিদ্যা ছড়িয়ে যায় আর আজ ইজরায়েল এরজন্যই অনেক বৈজ্ঞানিক উন্নতি করেছে। আমেরিকা এই ইহূদী কারিগরদেরও নিজের কাছে শরণ দেয়। আজও ইজরায়েলের পর সবথেকে অধিক ইহূদী আমেরিকাতেই রয়েছে তথা প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ রূপে আমেরিকার

রাজনীতির মধ্যে অধিক ক্ষমতা রাখে। যেই ইহূদীদের কাছে ভূমির কোনো এক টুকরোও ছিল না আজ আমেরিকার উপর মজবুত হয়ে নিজের জন্য এক নতুন দেশ ইজরায়েল বানিয়ে ফেলেছে আর টেকনিক্যাল উন্নতিও করেছে।

এটা ছিল জার্মানির শক্তি আর টেকনিক যার পিছনে হিটলারের সমর্থন আর প্রোৎসাহন কাজ করছিল। যেই হিটলারকে সারাবিশ্ব মিত্র দেশদের দুষ্প্রচারের কারণে সংসারের সবথেকে খারাপ ব্যক্তি বলে থাকে, সেই হিটলার আর জার্মানির শক্তির উপর আজকের এই বৈজ্ঞানিক দুনিয়া লাফালাফি করছে। অর্ধেক বিশ্বের উপর অত্যাচারকারী যদি ব্রিটেন ভালো হয় তবে হিটলার কিভাবে খারাপ হয়ে গেল? জাপানের উপর পরমাণু বোমা বর্ষণকারী আমেরিকা ভালো তাহলে হিটলার খারাপ হল কিভাবে? যে ভারতীয় হিটলারের বিরোধ করে তাদের জানা উচিত যে, এই হিটলার আর জার্মানী সুভাষচন্দ্র বোসের সঙ্গ দিয়ে ছিল। আমাদের সেনা ব্রিটেনের গুলামীর কারণে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। ব্রিটেন আমাদেরও শত্রু ছিল আর শত্রুর শত্রু মিত্র হয়ে থাকে। আমরা মিত্রকে সেই সময়ের কিছু মূর্খ নেতাদের প্রতারণায় এসে তাকে শত্রু মেনে নেই। ফেব্রুয়ারি ২০২০তে আমি (রাহুল আর্য) ইউরোপে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। নেদারল্যান্ডের "দ্য হেগ" নগরের বসবাসকারী লিও নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে এই বিষয়ে চর্চা করার উপলক্ষ্য প্রাপ্ত হয়। মূল রূপে সে ব্যক্তি ডাচ ছিল। কিছু সময় পর্যন্ত বর্তালাবে জানা যায় যে, ঐতিহাসিক ঘটনার ভালো জানকারী তার কাছে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানী নেদারল্যান্ডের রাজধানী এমস্টার্ডমকে নিজের কব্জায় নিয়ে নিয়েছিল তা সত্ত্বেও হিটলারের থেকে অধিক খারাপ মিত্র দেশগুলোকে বলছিল।

সবাই জানে যে, হিটলারের রকেটের জন্য ব্রিটেনে ৩,০০০ জন লোক মারা যায় কিন্তু এটা কেউ বলে না যে, ব্রিটেনের হাওয়াই হামলায় প্রাচীন নগর কোলোনকে পুরো ধ্বংস করে ৫০,০০০ এর অধিক লোকেদের মারা হয়েছিল। সে বলছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের প্রচণ্ড অপমান করা হয়েছিল। তাদের হাঁটু গেড়ে বসে নাক ঘষতে হতো। তারপর জ্ঞাত ইতিহাসের সবথেকে অপমানজনক "বর্সায়ের সন্ধি" হয়েছিল। এতে না কেবল জার্মানির উপর অপার আর্থিক ঋণের বোঝা ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বরং জার্মানী জনগনকে তাদেরই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘ দেশগুলোর শর্তে গুলাম বানিয়ে রাখা হয়েছিল। কেউ ভাবতেও পারবে না যে, সেই ঋণ শোধ করতে জার্মানীকে ৯২ বছর লেগেছিল। (A. Hall, "Germany ends World War One reparations after 92 years with £59m final payment", Mail Online updated 29 September 2010, dailymail.co.uk)

জার্মানীর জনগন ক্ষুধার্তে মারা যাচ্ছিল। অর্থ ব্যবস্থা সমাপ্ত হয়ে গেছিল। এমতাবস্থায় দেশে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল যেখানে যেকোনো বিশ্বযুদ্ধের মতো লোক মারা যেতে পারতো। এইরূপ পরিস্থিতিতে হিটলার সামনে আসে আর দুঃখী দেশকে নতুন দিশা দেখায়। সন ১৯২৯-১৯৩০ এর আর্থিক সংকটের প্রকোপ কম

হওয়ার পরেও জার্মানীর কয়েকটি বড় ব্যাংক হঠাৎই কাঙ্গাল হয়ে যায়, যার মালিক ইহূদী লোকেরা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আর সন্ধির সময় জার্মানীর উপর ইহূদী নেতাদের আর কমিউনিস্টদের হাতে ক্ষমতা ছিল। লোকেদের মনে তাদের প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হয়ে গেছিল। যেসব লোকেরা বলে যে, হিটলার জার্মানী লোকেদের প্ররোচিত করছিল সেসব ব্যক্তি মানুষদের মানসিকতা, সংবেদনা আর পরিস্থিতিকে বোঝার চেষ্টাই করেনি। এটা জার্মান জনগণই ছিল যারা হিটলারকে জন্ম দিয়েছিল। যখন আমি জার্মানিতে পৌঁছাই আর কয়েকটি মিউজিয়ামে যাই তো দেখি যে, জার্মানী জনগন নিজের মাতৃভূমিকে প্রাণের চেয়েও অধিক ভালোবাসে। ১৮৭১-রে ফ্রান্সের কাছে যুদ্ধ জেতার পরেও জার্মানী বিজিত ক্ষেত্র এক সন্ধি দ্বারা ফিরিয়ে দিয়েছিল। এরকম আত্মসম্মানী রাষ্ট্রের সঙ্গে জবরদস্তি "বর্সায়ের সন্ধি" করে নেওয়া কোটি-কোটি জনগনকে ক্ষুধার্ত আর অসহায়ের দিকে ফেলে দেওয়ার মতো ছিল। বাস্তবে এই যুদ্ধ জার্মানী প্রারম্ভ করেনি, মনে হচ্ছে সংসার ভুলে গেছে যে, কিভাবে ফ্রান্স, ব্রিটেন, ডাচ তথা পর্তুগালরা অর্ধেক বিশ্বকে গুলাম বানিয়ে আর তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছিল।

সব মানুষের মধ্যে গুণ দোষ হয়ে থাকে। আমি এটা বলছি না যে, হিটলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিল। নিশ্চিত রূপে হিটলারের কিছু কাজ তাকে অনেক খারাপ বলতে বিবশ করবে কিন্তু হিটলারের বিরোধী বিশ্বের সবথেকে খারাপ লোক ছিল। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সংসারে অবশ্যই ঘটে থাকে। সংসারের বড় শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য হিটলারকে ঘরে আওয়াজ কারীদের পিষে ফেলতে হয়েছে। যুদ্ধ কখনোই পূর্ণতঃ ব্যবস্থিত হয়ে চলে না যে, কোনো এক স্থানে দুজনকে মারতে হলে দুজনই মরবে। রাজ আদেশ তো দুইজনকে মারার হয় কিন্তু ১০০ -ও অধিক মরতে পারে। রাজা একা নির্ণয় করে না। কিছু নির্ণয় দেশ, কাল, পরিস্থিতির উপরেও হয়ে থাকে। সৈনিক অথবা জনগণের আক্রোশও কয়েকবার রাজাকে সামলাতে হয়। যেরকম ব্রিটেনরা ভারতীয়দের উপর অপমান করেছিল তারথেকেও জঘন্য ব্যবহার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী জনগণের সঙ্গে করা হয়। সুতরাং কয়েকবার লোককে স্বয়ংই নির্ণয় করার উপর দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

১৮৫৭ এর ক্রান্তিতে অনেক অপ্রিয় আর ভুল ঘটনাও ঘটিত হয়েছিল তবে কি এটা বলা হবে যে ইংরেজরা সজ্জন লোক ছিল আর ভারতীয়রা অত্যাচারী ছিল? হিটলার অনেক ধরনের পাপ করেছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা যাওয়া লোকেদের প্রাণ ব্যর্থ যায়নি। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এতই দুর্বল হয়ে গেছিল যে, তাদের সব গুলাম দেশগুলোকে স্বতন্ত্র করতে বাধ্য হয়েছিল। ইউরোপে গিয়ে আমি হিটলার, জার্মানী লোক তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধিত অনেক ধরনের আশ্চর্যজনক জানকারী জানতে পারি যা সম্ভবতঃ গুগল অথবা সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা কখনোই পেতাম না।

বাস্তবে বিজেতাই ইতিহাসের নির্মাণ করে থাকে। ভারতীয় ইতিহাসের নির্মাণ ঈসাই ইংরেজ জাতি করেছিল। ইতিহাসের নামে মিথ্যা প্রচার করে সদা সর্বদার জন্য গুলাম মানসিকতা ভারতীয়দের মধ্যে ভরে দেওয়ার

কাজ করে দিয়েছিল। সেই প্রকারে আপনি যেখানেই খোঁজ নিতে বেরোবেন আপনি কেবল হিটলারের বিরুদ্ধেই সব তথ্য আর জানকারী পাবেন। সব সাহিত্য আর পুস্তকগুলো হিটলারের বিরুদ্ধে পাবেন। লেখনী রাজ্যের পক্ষে সদা চলে আসছে। স্টালিন আর মাও এর মতো কোটি-কোটির গনহত্যাকারী কিছু পৃষ্ঠায় সঙ্কুচিত করে রাখা হয় আর হিটলারের উপর বিশ্বের প্রত্যেক পুস্তকালয়গুলোতে নাকারাত্মক সাহিত্যে ভরে দেওয়া হয়। সজ্জনগণ! যুদ্ধ কারোর জন্যই ভালো হয় না। রাজা যতই ভালো হোক না কেন যুদ্ধের সময় নির্দোষের হত্যা আর অপ্রিয় ঘটনাকে থামাতে পারে না।

এটা সত্য যে হিটলার ইহূদীদের জন্য কঠোর দৃষ্টিকোণ ধারণ করেছিল আর কয়েক লক্ষ ইহূদী এতে মারা যায়, এটাও সত্য যে, ইহূদীদের উপর অত্যাচার হয়েছিল। কিন্তু কেউ কি এই কথার উপর চর্চা করে যে, ইহূদী শেষ ২৫০ বছর ধরে বিশ্বের অর্থব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ রূপে নিয়ন্ত্রণ করে চলছে। ব্যাংক আদির সঞ্চালিত কর্তার মধ্যে সবার অধিক ইহূদীদের রয়েছে। সংসার কি জানে না যে, এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে কিরকম ভয়ংকর লুট চলে। কোটি-কোটি জনগণের পরিশ্রমের টাকা প্রত্যেক ১০ বছরে নষ্ট হয়ে যায় যার দরুন লক্ষ-লক্ষ অপরাধ বিশ্বে হচ্ছে। পর্দার পিছনে লুকিয়ে থাকা এই লোকগুলোকে কখনও মানবতার শত্রু কেন বলা হয়নি? বাস্তবে সংসার যা প্রত্যক্ষ দেখে তাকেই সত্য বলে মেনে নেয়। আজ সংসারে কোনোকিছুই পড়ে শুনে অথবা দেখে নিয়েই সত্য-অসত্যের নির্ণয় করা যেতে পারে না। যদি এরকমটা হতো তবে ভগৎ সিংহ, রামপ্রসাদ বিস্মিল, চন্দ্রশেখর আজাদের মতো সকল বিপ্লবীদের ইতিহাসে আতঙ্কবাদীর স্থান হয়েছে। আপনাদের মধ্যে কিছু লোকেই হয়তো জেনে থাকবেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু ভারত দেশের যুদ্ধ বন্ধি ছিলেন। যদি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতে ফিরে এসেও যেতেন তবে তাকে ব্রিটেনের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার সন্ধির উপর নেহেরু হস্তাক্ষর করেছিল। এই কারণে ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসু জীকে ভারতের শত্রু সিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ১০০ বছর পর এসবই পুস্তকের প্রমাণ হয়ে যাবে আর নতুন প্রজন্ম সত্যকে ভুলে যাবে।

বাস্তবে বলার তাৎপর্য হল এই যে, আধ্যাত্মিক উন্নতিকে ছাড়া ভৌতিক উন্নতি এইভাবে বিনাশকারী সিদ্ধ হবে। এটা সংক্ষেপে ইতিহাস বলার এটাই অর্থ হল যে, যেই বিজ্ঞানের পিছনে আজ সংসার দৌড়াচ্ছে, যেই ধন সম্পদকে হাতিয়ে নিতে পুরুষার্থ করছে তার সমাপ্ত এক ভয়ানক যুদ্ধ দ্বারাই হয়ে থাকে। আজও বিশ্ব সেই একই রীতিতে আগে বেড়ে চলেছে যার পরিণাম মহাবিনাশকারী যুদ্ধই হবে যাকে কেউই আটকাতে পারবে না। এই বর্তমান বিজ্ঞানের পূর্ণ লাভ তারাই তুলতে পারবে যার মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান রয়েছে। এই বিশ্ব সংসারকে বাঁচানো আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য কোনো মার্গ নেই।

৫১৫৬ বর্ষ পূর্ব মহাভারতের ইতিহাস

ইতিহাসের এই মজাদার ও জ্ঞানবর্ধক সত্য ঘটনা হতে একটা কথা স্পষ্ট হল যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে টেকনিক স্থানান্তরণ জার্মানী থেকে মিত্র দেশগুলোতে হয়েছিল। পেনমুন্ডে গ্রামে কারখানার খণ্ড-ভাঙ্গা অবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল। কল্পনা করুন যে, যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর মতো সব সম্মিলিত দেশেগুলোর বিনাশ হয়ে যেত অথবা অনেক বড় পরমাণু যুদ্ধ হয়ে যেত তাহলে সকল দেশের বৈজ্ঞানিক ও রিসার্চকারী স্থান, কারখানাগুলো সর্বপ্রথম নষ্ট হয়ে যেত আর সংসার পুনঃ অন্ধকারে চলে যেত। এরকমই ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ৫১৫৬ বর্ষ পূর্বে, যখন মহাভারতের যুদ্ধ হয় যেখানে চীনের ভগদত্ত, পাতাল দেশের (আমেরিকার) বভ্রুবাহন, ইউরোপ দেশের (হরিবর্ষ বলা হত - হরি সংস্কৃতে বাঁদরকেও বলে বাঁদরের মতো নেত্র যাদের) বিডালাক্ষ, য়ূনান ও ইরানের শল্য, কান্ধার আদি অনেক বড়-বড় শক্তিশালীরা ভাগ নিয়েছিল। মহাভারতে অর্জুনের বিবাহ আমেরিকার রাজার কন্যা "উলোপী"র সঙ্গে হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশত সেই যুদ্ধে মহাবিনাশ ঘটেছিল। যা বা কিছু বিদ্বান শিল্পী বেঁচে ছিল তাদের আয়ু টেকনিককে পুনরায় দাঁড় করার জন্য সাধন-সংসধন জুটাতেই পেরিয়ে যায়। পরিণামস্বরূপ পরবর্তী প্রজন্ম অন্ধকারে চলে যায়। সাহিত্য, গ্রন্থ আদি সব নষ্ট হয়ে গেছিল। যা কিছু অবশিষ্ঠ ছিল তাকে বুঝাতে ও বোঝার কেউই জীবিত ছিল না। পরবর্তীতে বিদেশি আক্রমণকারীরাও আমাদের অমূল্য পুস্তক ও পুস্তকালয়গুলোকে নষ্ট করে দেয়। নালন্দার পুস্তকালয়ে যখন মুসলিমরা আগুন জ্বালিয়ে দেয় তখন ৬ মাস পর্যন্ত ধুঁয়ো উঠতে থাকে এত সাহিত্য নষ্ট হয়ে গেছিল। এত কিছু হওয়ার পরেও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারত থেকে য়ূনান, সেখান থেকে আরব আর ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছায়। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে এখন তুলে ধরা হবে। ফ্রান্সুয়া বর্নিয়ার বলে যে, *"আমরা অনেক চেষ্টা করেও বেদ প্রাপ্ত করতে পারিনি কারণ ভারতবাসীরা বেদকে লুকিয়ে রাখতো কারণ মুসলিমের হাতে পড়লে তারা যেন জ্বালিয়ে না দেয়।"* (বর্নিয়ারের ভারত যাত্রা, পৃষ্ঠ ২৩৪)

জার্মানীর বিজ্ঞানের মূল স্রোত

যেভাবে বিজ্ঞানকে নিজের বানানোর প্রতিযোগিতা চলে আসছে ঠিক সেভাবেই আর্য শব্দকেও নিজের বানানোর প্রতিযোগিতা চলে আসছে। ইতিহাসের সবথেকে প্রাচীন গ্রন্থে আর তালপাতাগুলোর মধ্যে আর্য শব্দ ভালো, সভ্য, সজ্জন, পরোপকারী, বৈজ্ঞানিক আর মানবীয় গুণে সম্পন্ন লোকেদের জন্য এসেছে।

নিজের স্বর্ণিম ইতিহাসকে গুরুত্ব না দেওয়া জবাহরলাল নেহেরুও নিজের **"হিন্দুস্থান কী কাহানী"** তে লিখেছে যে, *"আশ্চর্য্য ব্যাপার যে এখন পর্যন্ত ষাট (৬০) হাজারের অধিক সংস্কৃতে হাতে লেখা পুস্তকের আর তাদের রুপান্তরণের ঠিকানা পাওয়া গেছে আর নতুন নতুন গ্রন্থ বরাবর পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দুস্থানের এমন অনেকগুলো পুস্তক এখন পর্যন্ত এখানে পাওয়াই যায়নি অন্যদিকে তাদেরই অনুবাদ চীনী আর তিব্বতী ভাষায় পাওয়া গেছে।"* (জবাহরলাল নেহেরু, "হিন্দুস্থান কী কাহানী", পৃষ্ঠ ১১০)
ভেবে দেখুন যে, সেসব গ্রন্থ আজ কোথায় গেছে? যারা আমাদের গুলাম্ বানিয়ে ছিল তারা সেসব অমূল্য গ্রন্থগুলোকে নিজের দেশে নিয়ে গেছে। নেহেরু কখনও এই বৌদ্ধিক সম্পদাকে পুনঃ ফিরে নিয়ে আসার জন্য ব্রিটেনের সঙ্গে চর্চাও করেনি। যেসব লোকেরা তামিল আদি অন্য ভাষাকে সংস্কৃতের থেকেও প্রাচীন বলে মনে করে তারা ৬০,০০০ হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শুনেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে হয়তো। একবার ভাবুন হাজার-হাজার বর্ষ পূর্বের প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে আর্যদের আর তাদের বিজ্ঞানের বিষয়ের না জানি কত গুরুত্বপূর্ণ কথা ভরা রয়েছে। এটাই হল কারণ যারজন্য ইউরোপ দেশ আর তাদের ইতিহাসকার নিজেকে আর্যদের সন্তান বলছে আর এরজন্য একটা শব্দ ইতিহাসকারেরা বের করেছে - আর্য পরিবার অথবা বলতে পারেন ইন্ডো-ইউরোপিয়ান। এই ইতিহাসকারেরা স্বয়ংকে তো আর্য বলা শুরু করেছে কিন্তু আর্য শব্দের ব্যাখ্যা ভুল করে বসেছে। আর্য জন্মে নয় বরং কর্মে হয়ে থাকে কিন্তু এনারা আর্য শব্দের মহানতাকে দেখতে পেয়ে আর্য শব্দের সঙ্গে রং, রূপ, জাতি আদি জুড়ে দেয়। এইপ্রকারে সকল ইতিহাসকারেরা নিজের-নিজের দেশের লোকেদের আকৃতির অনুসারে আর্য শব্দের অর্থ লাগিয়ে দেয়। বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতার মতো আর্য শব্দের প্রতিযোগিতাও বিনাশকারী সিদ্ধ হয়ে যায়। হওয়া এটা উচিত ছিল যে, যেখান থেকে এই আর্য শব্দটি বেরিয়েছে অর্থাৎ বেদ থেকে, তাই বেদ জ্ঞানী লোকের কাছে আর্য শব্দের ব্যাখ্যা করানো উচিত ছিল কিন্তু স্বার্থে অন্ধ লোকে বিনাশ করতে উদ্যত হতে থাকে।

হয়েছিল এই যে, হিটলারের মতো সাধারণ সৈনিক জেলে থেকে আর বাইরেও প্রাচীন উপলব্ধ ইতিহাসের সহস্র পুস্তক পড়ে ফেলেছিল। সেখান থেকেই তার বিচার দৃঢ় হতে থাকে যে কেবল শ্রেষ্ঠ আর মানবতাবাদী লোকেদেরই সংসারে বাঁচার অধিকার আছে, অপরকে অপমানিত করে লুটকারীদের নয়। এছাড়া হিটলারের মান্যতা ভুল কিছু ছিল না শ্রেষ্ঠ লোকেদেরই বাঁচার অধিকার থাকা উচিত কিন্তু তার শ্রেষ্ঠতার পরিমাণ সেই ভুল ইউরোপের ইতিহাসের উপর আধারিত ছিল।

হিটলার জানতো না যে, জন্ম হতে সকল মানুষ সাধারণ হয়ে থাকে, তারপর ভালো কর্ম যারা করে তারা আর্য আর খারাপ কর্ম যারা করে তারা দস্যু হয়ে যায়। আর্যের সম্বন্ধ কোনো এক দেশ, সভ্যতা অথবা জাতি থেকে হয় না। হিটলার শ্রেষ্ঠ মানব জাতি বানানোর জন্য অনেক প্রয়োগ করে যা নিশ্চিত রূপে অব্যবস্থিত, বিনা কোনো পরিকল্পনার ছিল আর জার্মানীর সব সাধন সংসাধন সেনা আর যুদ্ধের কারণে সেসব প্রয়োগ অসফল হয়ে যায় কারণ অধিকাংশ স্থানগুলোতে থাকা লোকদের বিনা ধ্যান দেওয়ায় মরে যাচ্ছিল। যে

কোনো বুদ্ধিমান সহজেই বুঝতে পারবে যে, এক লেখকের লেখায় কত বড় ক্ষমতা হয়ে থাকে যে সে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণও হয়ে যেতে পারে আবার লক্ষ লক্ষকে জীবনদান দেওয়াও সিদ্ধ করতে পারে। হিটলারকে পাপী বলা ব্যক্তিরা কখনও সেই ইতিহাসকারদের বিশ্লেষণ কেন করেনি যারা আর্য শব্দের ভুল ব্যাখ্যা করেছিল আর যাদের সাহিত্য পড়ে হিটলারের মিথ্যা জ্ঞান হয়েছিল? সংসারের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে আর্য শব্দের মহানতা দেখে ইউরোপবাসীরা ভারতীয়দের কাছ থেকে এই আর্য শব্দ ছিনে নেওয়ার জন্য ইতিহাসকে বিকৃত ভাবে লেখে কিন্তু হিটলার কিছু বছরের মধ্যেই সকলের বুদ্ধি ঠিকানায় লাগিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পরে মিত্র দেশেরা পরাজিত দেশগুলোর উপর আর কোনো দুর্ব্যবহার করেনি। এইবার সকলের জানা হয়ে গেছিল যে লোকেদের অত্যাচার করা ভালো নয় অন্যথা পুনঃ পুনঃ হিটলার আসতে থাকবে।

এখন প্রশ্ন উঠছে যে, জার্মানী তথা জাপানের মতো দেশগুলো বিজ্ঞানে এত উন্নতি প্রাপ্ত কিভাবে করলো? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর বায়ু সেনার কাছে প্রায় ২৫০০ বিমান ছিল। ব্রিটেন আর ফ্রান্স মিলেও জার্মানীর মুকাবলা করতে পারতো না। জার্মানিতে এত উন্নত পদার্থ বিদ্যার পিছনে কে ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং হিটলার লিখে দিয়েছে যে -
"Every manifestation of human culture, every product of art, science and technical skill, which we see before our eyes two-day, is almost exclusively the product of the Aryan creative power. Aryan alone who founded a superior type of humanity. If we divide mankind into three categories - founders of culture, bearers of culture, and destroyers of culture - the Aryan alone can be considered as representing the first category." On the next page he said that "the present Japanese development has been due to Aryan influence." (Mein Kampf, হিটলার কী আত্মকথা "মেরা সংঘর্ষ", পৃষ্ঠা ২৩২ থেকে উদ্ধৃত)
হিটলার স্পষ্ট বলছে যে জার্মানী, জাপান ও বিশ্বের সব কিছুতে যত জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা ধার্মিকতা রয়েছে সেসব হল আর্যদের দান। হিটলারের থেকে প্রায় ৪৭ বছর পূর্বে মহর্ষি দয়ানন্দ জী **"সত্যার্থ প্রকাশ"** এর মধ্যে যা লিখেছিলেন অক্ষরশঃ সেটাই হিটলার ৪৭ বছর পরে লিখে দিয়েছে।

"অহম্ ভূমিমদ্দাম আর্য়ায়" (ঋগ্বেদ ৪|২৬|২)

ঈশ্বর বেদের এই মন্ত্রে বলেছে যে, আমি এই ভূমি আর্যদের দিচ্ছি। আর্য কখনোই দস্যুদের কাছে হেরে ভীতুর মতো লুকিয়ে যেন না থাকে এটাই হল ঈশ্বরের আদেশ। হিটলার এটাই বলেছে যে, বিশ্বের উপর কেবল আর্যদের কব্জা হওয়া উচিত আর সকল জার্মানীরা হল আর্য। সকল নাজী লোকেরা হল আর্য। সে হিন্দুদের চিহ্ন **"স্বস্তিক"** (卐) -কে নিজের পতাকাও বানিয়ে ফেলেছিল। সে কোনো ইতিহাসকার নয় কিন্তু

একজন নেতা ছিল আর নেতা শোধের কাজ করতে পারে না। এইজন্য হিটলার যত শোধ করতে পেরেছিল সেটাও এক রাজার জন্য বড় ব্যাপার ছিল। কিন্তু আর্য কারা? এই প্রশ্নের খোঁজ সে করতে পারেনি আর অর্ধেক জ্ঞানের পরিণাম ভয়ংকরই হয়েছিল। হিটলারের একটাই ভুল হয়ে যায় সেটা হল আর্যকে জন্মগত মানার। তবুও এটা স্পষ্ট আর সমস্ত বিশ্ব জানে যে Vedas are the foundation head of all art, science and technology.
অস্তু, জার্মানীতে আজও সংস্কৃতে কথা বলার রীতি রয়েছে। সেখানে ১৪ টি ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত ও বেদের অধ্যয়নও হয়। আজও লক্ষ লক্ষ লোকে সেখানে নিজেকে আর্যদের সন্তান বলে মনে করে। আমি মনে করি যে, যদি ইউরোপ লোকেদের কাছে আর্য আর বেদের সঠিক সঠিক অর্থ পৌঁছানো যায় তবে সম্ভবতঃ সংসারে সংশোধন শীঘ্র হতে পারে অন্যথা বিনাশের পর সংশোধন আপনা-আপনি হয়েই যাবে। আমার মনে হয় যে, আজকের পরে কেউ এটা বলতে পারবে না যে বর্তমান সময়ে আর্যরা কিরকম বৈজ্ঞানিক টেকনোলজি দিয়েছে। ২১ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানের আঁধার হল আজও আর্যরাই, আগেও আর্যরাই ছিল, আর পরবর্তীতে আর্যরাই থাকবে।

আজ আর্যদের হিন্দু বলা হচ্ছে
বেদে ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছে যে -

ইন্দ্রম্ বর্ধন্তো অপ্তুরঃ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ অপঘ্ননন্তো অরাব্ণঃ

(ঋগ্বেদ ৯|৬৩|৫)

অর্থাৎ - হে মানব! নিজের ঐশ্বর্য, ধন, সম্পদা, বল বাড়াও, তারপর সম্পূর্ণ সংসারকে আর্য (শ্রেষ্ঠ) বানাও, যেসব দুষ্ট, রাক্ষস পথে বাঁধা হবে তাদের সর্বনাশ করে দাও।

আজকে যারা ঈসাই আর ইউরোপের প্রতি প্রভাবিত হয়ে আর্য, সংস্কৃত আর বেদের অপমান করে থাকে, তাদের শক্ত প্রমাণের উপর আধারিত এই পুস্তকটি বার-বার পড়া উচিৎ। একটা কথা সকল মানুষদের বোঝা উচিত যে, পক্ষপাতপূর্ণ মনোভাব দ্বারা মানবতার উন্নতি হয় না বরং সত্যের উপর আধারিত জ্ঞান প্রাপ্ত করেই মানবতাকে সুখ, শান্তি তথা সমৃদ্ধির দিশায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

এখন এক উদাহরণের রূপে সৃষ্টির আদি থেকে বর্তমান রাষ্ট্রের গঠনকে এক উদাহরণ দ্বারা বোঝা যেতে পারে। ল্যাটিন ভাষা ইউরোপের প্রাচীনতম ভাষার মধ্যে মানা হয় যার থেকে ইংরেজির মতো কয়েকটা ভাষা বেরিয়েছে। সংস্কৃতে পিতার জন্য পিতৃ শব্দ রয়েছে তো ল্যাটিনে পেটর তথা ফ্রেঞ্চে পাত্রী উদাহরণ রয়েছে। ইংরেজির পৈট্রিয়ার্ক শব্দটিও পেটর থেকে বেরিয়েছে। টয়ুটনিক, ইটালিয়ান, গ্রীক, কেল্টিক, স্লাবনিক, ফারসি, জিন্দ, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান আদি সকল ভাষাগুলো আর্য পরিবারের ভাষা সিদ্ধ হয়ে গেছে।

সংস্কৃতের অগ্নি শব্দ ল্যাটিনে ইগ্নিজ হয়ে গেছে, লিথুয়ানিয়ায় অগ্নিস, স্কটল্যান্ডের ভাষায় ইঙ্গিল, অঙ্গিল আদি হয়ে গেছে। সংস্কৃতের মূষক শব্দ গ্রীকে মূস, প্রাচীন স্লাবনিকে মাইস, ল্যাটিনে মস, প্রাচীন জার্মানে কোথাও মুস তো কোথাও মাউস দেখতে পাবেন।

ম্যাক্সমুলার নিজের পুস্তক *"আমরা ভারত থেকে কি শিখেছি" এর মধ্যে লিখেছে যে, "আজ প্রত্যেক ছাত্র জানে যে ইংরেজি আর্যদের ভাষা। আমরা জানি যে, ভারতীয় ভাষা, টয়ুটনিক, ইটালিয়ান, গ্রীক, কেল্টিক, স্লাবনিকে, আর ফারসি আদি সকল ভাষাগুলো হল একই ভাষা বৃক্ষের শাখা।"* (ম্যাক্সমুলার, "আমরা ভারত থেকে কি শিখেছি", পৃষ্ঠ ৫৪)

যে বৃক্ষের কথা ম্যাক্সমুলার বলছে সেটা হল সংস্কৃত আর এর থেকে বের হওয়া অনেক আধুনিক ভাষাগুলোকে আর্য পরিবারের ভাষা বলে। ম্যাক্সমুলার এরপর লিখেছে যে, *"একা ভারতেরই সাহিত্য য়ূনান আর রোমের সাহিত্যের থেকে কয়েক গুন বিশাল বড় আর এত বিশাল সাহিত্যকে কেবল এরজন্য মিথ্যা বলা হয়েছিল যে এমনটা না করলে এটা স্বীকার করতে হচ্ছিল যে ভারতীয় আর ইউরোপীয় লোক হল একই বৃক্ষের দুটি শাখা। আমরা ইউরোপীয়রা নিজেদের বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এত কট্টর হই যে আমরা ঈসাকে মেরেছি, সুকরাতকে মেরেছি তথা এমনকি গৈলীলিও (গ্যালীলিও) -কেও প্রায় মেরেই ফেলেছি। কম বেশি অসংখ্য লোকে আমাদের এই কট্টরতার শিকার হয়েছে।"* (ম্যাক্সমুলার, "আমরা ভারত থেকে কি শিখেছি", পৃষ্ঠ ৫৫)

ভারতীয় ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রস্তুতকারক প্রসিদ্ধ বিদেশী লেখক ম্যাক্সমুলার এরপরেও আর্যদের শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ করার সঙ্গে লিখেছে যে, আর্য সভ্যতাকে আমাদের বিশাল রূপেই গ্রহণ করা উচিত কারণ হিন্দু, পার্শিয়ান, য়ূনানী, রোমান, স্লাব, কেটল তথা ট্যুটন জাতিগুলো সবই সেই আর্য জাতির সঙ্গে সম্বন্ধিত। বিশ্বের যতই গণ্যমান্য অর্থাৎ উত্তম ও উন্নত সভ্যতা রয়েছে সবই হল আর্য সভ্যতার অঙ্গ।"

জীবনের অন্তিম সময়ে ম্যাক্সমুলার নিজের কয়েকটি পূর্ব করে থাকা ত্রুটিগুলোকে সংশোধনের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার জ্ঞানের স্রোত সেই পুরনোই ছিল। এটা সত্য যে ম্যাক্সমুলার ইতিহাসের কিছু কিছু জানকারী রাখতো তবে ধর্ম নিয়ে তার এতটুকুও জ্ঞান ছিল না কিন্তু তবুও ম্যাক্সমুলার বেদের ইংরেজিতে নিজের মন মতো অর্থ করে দেয়। পরবর্তীতে ভারতের অন্য ভাষাতেও সেটাই পড়ানো শুরু হয়ে যায় যা আজ পর্যন্তও ভারতে সেটাই পড়ানো হচ্ছে। তাকে অতি শীঘ্র প্রভাব থেকে থামানো আবশ্যক। এমনকি প্রাচীন সভ্যতা তথা সংস্কারগুলোকে অনাবশ্যক মান্যকার জবাহরলাল নেহেরুও বলছে যে -

"ষাট হাজারেরও অধিক হস্ত লিখিত প্রাচীন পান্ডুলিপি ভারত থেকে ইউরোপ ইংরেজরা নিয়ে চলে গেছে।" (হিন্দুস্থান কী কাহানী, জবাহরলাল নেহেরু, পৃষ্ঠ ১১০|| নেহেরু পরিবার উচ্চ ইংরেজ অধিকারীদের এমনকি বায়সরায় পর্যন্ত সম্পর্ক রাখতো সুতরাং নেহেরুর এটা বলা অক্ষরশঃ সত্য হবে)

যদি ভারতীয়রা গরু-মোষ পালকই ছিল তাহলে এত বড় সংখ্যার শাস্ত্রগুলোকে ভারত থেকে বাইরে কেন নিয়ে যাওয়া হয়? যদি ভারত সাপুড়েদেরই দেশ ছিল তবে সেই সাপুড়েদের গ্রন্থগুলোকে কেন ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়? আসলে, শেষ ২৫০-৩০০ বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের উন্নতিতে সেই প্রাচীন শাস্ত্রগুলোর অনেক বড় অবদান ছিল। বাস্তবে, যেকোনো নতুন পদার্থ বানানোর মধ্যে প্রাচীন মানুষদের অনুভব সর্বদাই কাজে এসে থাকে। প্রাচীন ভাষা থেকেই নতুন-নতুন ভাষা তৈরি হতে থাকে কিন্তু সেই প্রাচীন ভাষার গুরুত্ব কখনও কমে যেতে পারে না কারণ যখন-যখন নতুন ভাষার শব্দের অর্থ করা হয়ে থাকে তখন তাকে সেই শব্দের আদি মূল স্রোতকে খুঁজতেই হয়।

ইহূদী আর ঈসাই নিজেদের ধার্মিক ইচ্ছা প্রকট করার জন্য "**ওম্**" -কে আজও "**আমেন**" বলে। মুসলিমরা একে "**আমীন**" বলে। শিখ সম্প্রদায় একে "ওঙ্কার" অর্থাৎ "ওম্কার" বলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা একে **"ওম্ মণিপদ্মে"** বলে। অস্তু, ম্যাক্সমুলারের এই কথা কিছুটা হলেও সত্য যে, অর্ধেক সংসারের ভাষা সংস্কৃত থেকে বেরিয়েছে। মানতেও হবে কারণ সারা বিশ্বে এর প্রমাণ প্রচুর পরে রয়েছে। কিন্তু আমার স্পষ্ট মত হল যে, বিশ্বের অর্ধেক নয় বরং সব ভাষাই সংস্কৃত থেকে বেরিয়েছে, কারণ সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর মানুষদের সংস্কৃতিতেই বেদ জ্ঞান দিয়েছিল। ইউরোপের জনগণ আর বিদ্বান এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে, ইউরোপের লোক আর্যদেরই সন্তান। এখন যদি এই ইউরোপীয়রা নিজেদের ভারত থেকে সেখানে গেছে বলে মানে তবে তারা নিজের-নিজের দেশের মধ্যে বিদেশী বলতে হবে। এইজন্য তারা আর্যকেই ভারতের বাইরে সিদ্ধ করে দেয় যেন আর্যদের সন্তান অর্থাৎ যারা ইউরোপবাসী রয়েছে তারা যেন নিজেদেরই দেশে বিদেশী না হয়ে যায়। বাস্তবে বিশ্বের উৎপত্তির সময় সর্বপ্রথম মানুষগণ ত্রিবিষ্টপ অর্থাৎ তিব্বতে জন্ম নিয়েছিল এটা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী জীর নিজের অনুভব ও বিস্তৃত ভ্রমণে প্রাপ্ত করা জ্ঞানের আধারে মত ছিল। কিছু কাল পশচাৎ যখন মানুষদের মধ্যে নিজেদের কলহ বিবাদ বেড়ে যায় তখন যারা আর্য (শ্রেষ্ঠ) লোক ছিল তারা নিচে এসে বসবাস করা শুরু করে। আর্যদের বসবাসের কারণেই সেই ভূমির নাম **"আর্য়াবর্ত"** হয়। বাকি যারা দুষ্ট আর দস্যু লোক সংসারের অন্য ভাগগুলোতে যথা চীন, আফ্রিকা আদি স্থানগুলোতে চলে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে ভৌগলিক পরিস্থিতির কারণে রং, রূপ আর শরীরের গঠনে পরিবর্তন আসতে থাকে। আর্য়াবর্ত থেকেই আর্য লোক বিমান আদি বানিয়ে অন্য ইউরোপ আদি স্থানগুলোতে যেতে থাকে আর বাস করতে থাকে। এটা কোটি কোটি বছর পূর্বের কথা। সে সময় পর্যন্ত কেবল এক সংস্কৃত ভাষা আর্যদের ছিল। অনেক সময় পর্যন্ত নিজেদের মূল স্থান আর্য়াবর্ত থেকে দূরে থাকার কারণে ধীরে-ধীরে অন্য স্থানের আর্য বংশজদের মধ্যে মূল ভাষা সংস্কৃত আর সংস্কার হতে দূরত্ব প্রারম্ভ হয়ে যায়। এটা এমনই

যেরকম ২০০ বছর পর অধিকাংশ সাদা আমেরিকান ভুলে যায় যে তারা ইংরেজ জাতিরই বংশজ। সেই রকমই আমেরিকান ইংরেজি আর ব্রিটিশ ইংরেজিতে উচ্চারণ, শব্দ রচনা আদিতে কিছু সময়ের মধ্যেই অনেক অধিক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

এইভাবে দস্যু বিনা লেখাপড়া করে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিহ্ন বানিয়ে ব্যবহার করতো। ধরে নিন কেউ কুকুরের বিষয়ে কিছু বলতে চাইছে তো তাকে কুকুরের মতো আকৃতি বানাতে হত কারণ ভাষা তো সে জানতো না, ধীরে-ধীরে সেই আকৃতিগুলো চিহ্নের স্থান নিয়ে নেয়। পরে বর্ণমালা বেরিয়েছে আর তার প্রচলন হয়ে যায়। এটা এক প্রকারের চিত্রলিপি ছিল যা মিশ্র, ক্রিট আর বাবুল আদির মধ্যে উপস্থিত ছিল। চীনের লিপি হচ্ছে আজও চিত্রলিপির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

হরপ্পার ভাষা

কিছু লোকেরা প্রশ্ন তুলে থাকে যে, যদি মহাভারতের সময়ে সংস্কৃতের প্রচলন ছিল আর সংস্কৃত এত প্রাচীন তাহলে হরপ্পা সভ্যতার ভাষা কেন এখন পর্যন্ত পড়তে পারা যায়নি? প্রথম তো এরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারী বৌদ্ধ আর তামিল আদি লোকেদের পালী আর তামিল ভাষাও স্বয়ংই মাঠের বাইরে চলে গেল।
এখন সংস্কৃত ভাষাতে আসছি। মহাভারত যুদ্ধের ঠিক ঠিক সময় মহাভারতের বিষয়েই লেখা হবে কিন্তু আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছরের অধিক সময় পূর্বে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল। মহর্ষি বেদব্যাস্ জী এর কিছু বছর পরেই সেই ইতিহাসকে "জয়" নামক গ্রন্থ যা পরবর্তীতে "ভারত" আর "মহাভারত" নামে প্রসিদ্ধ হয়, লিখে দিয়েছিলেন। এখন এত বড় সংস্কৃতের গ্রন্থকে যদি কেউ না মানে অথবা ইংরেজী ইতিহাসকারদের ৮০০ খৃ০পূ০ মহাভারত গ্রন্থ লেখার কথা যদি কেউ মানে তাহলে তাকে কে আর কি করতে পারে? এরা হল এরকম ধরনের লোক যারা স্বার্থ, লোভ, ভয়, দ্বেষ তথা অহংকারে নিজের পিতাকে পর্যন্তও মানতে অস্বীকার করতে পারে।

মানবের উৎপত্তি ১,৯৬,০৮,৫৩,১২০ বছর পূর্বে হয়েছিল। এত লম্বা সময়ে সংস্কৃত থেকে অনেক ধরনের ভাষাই বেরিয়ে থাকবে আর নষ্টও হয়ে থাকবে। মহাভারতের সময়েও কোনো ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বিদ্যমান অবশ্যই ছিল। মহাভারতে দেখা যায় যে, যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর অর্জুনের দলে হামলা করে ছিনতাইবাজ ডাকুরা অনেকগুলো ধন আর মহিলাদের ছিনিয়ে নিয়ে ছিল। (মহাভারত, মৌসল পর্ব, অধ্যায় ৪) এই উদাহরণ দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে, মহাভারত এক সত্য ইতিহাসের ঘটনা ছিল কারণ যেকোনো পক্ষপাতী

পুস্তক কখনই নিজের নায়ককে অন্তিম সময়ে পরাজিত হওয়া দেখায় না, বাইবেল ঈসা - মূসাকে, কুরআন মুহাম্মদকে মহান ও চমৎকারী সিদ্ধ করে কিন্তু মহাভারতে ইতিহাস তেমনই লেখা আছে যেমনটা হয়েছিল, এমনকি অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণ জীর মৃত্যুরও বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, সেই সময় অনেক ডাকাতদের জাতিও উপস্থিত ছিল আর যুদ্ধের পর বড় বড় রাজাদেরও লুটে নিতে সক্ষম হয়ে গেছিল। এরকম ছোট ছোট জাতিদেরও নিজের-নিজের ব্যবহার জন্য ভাষা হয়ে থাকবে। এখন যা কিছু প্রমাণ হরপ্পার লিপি বলে প্রচারিত করা হচ্ছে সেটা কি সম্পূর্ণ হরপ্পার লিপি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর বিশ্বের কোনো ইতিহাসকারই দিতে পারেনি। আসলে যে বর্ণমালাকে দেখিয়ে হরপ্পার বলে প্রচারিত করা হচ্ছে সেটা কোনো ছোট-মোট ডাকাতি জাতি আদির নিজেদের চিত্রলিলিও তো হতে পারে। ষাট হাজার প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ যেগুলোকে ইংরেজরা প্রাপ্ত করে সঙ্গে নিয়ে যায়, সেগুলো কি আকাশ থেকে টোপকে ছিল?

নিশ্চিত রূপে ইতিহাসকে পুরোদমে বিকৃত করা হয়েছে। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবি ইতিহাসকারের মান্যতা হল যে, হরপ্পা সভ্যতা বর্তমান হিন্দু মান্যতার আঁধারের অনুরূপ সভ্যতা ছিল। উপস্থিত মুদ্রা ও অন্য পদার্থ আদির উপর মহায়োগীর চিহ্ন, ষাঁড় আদির চিহ্ন সিদ্ধ করছে যে সেটা আর্যদেরই সভ্যতা ছিল। যেসব বৌদ্ধরা ইংরেজ ইতিহাসকারকে মেনে মহাভারতকে ৮০০ খৃ০পূ০ লেখা গ্রন্থ বলে মনে করছে তারা তো এটাও জানে না যে ইংরেজরা মহাত্মা বুদ্ধের সময় কমাতে-কমাতে ১০০০ বছর কেবল এক লেখা চালিয়ে কমিয়ে দিয়েছে। অস্তু, ভারতের ইতিহাসের উপর জীবনে সময় পেলে তবে অবশ্যই এক বিস্তৃত গ্রন্থ লিখে এইসব প্রশ্নের প্রমাণিত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো।

ভারতীয় ইতিহাসের আসল তথ্যগুলোকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে আর মিথ্যা তথা অপ্রমাণিত কথাকে ইতিহাস বলে প্রচারিত করা হয়েছে। কিছু মুদ্রা তথা বস্তুর উপর খোদাই করা চিহ্নকে হরপ্পার লিপি বলে প্রচারিত করা হয় যাতে এটা সিদ্ধ করা যেতে পারে যে বেদ (সংস্কৃত) হরপ্পার পরবর্তী কালে লেখা হয়েছিল। ভারতকে যারা গুলাম বানিয়েছিল তারা ভয় পেতো যে, সংস্কৃত ভাষা আর বেদ যেন ঈসাইদের বাইবেলে লেখা সৃষ্টি রচনা (যা প্রায় ৪০০৬ খৃ০পূ০) থেকে প্রাচীন সিদ্ধ না হয়ে যায়। এই প্রকারে তারপর আর্যদের ভারতে বাইরে থেকে আসা লিখে দেওয়া হয়।

আপনাদের মধ্যে অনেক কম লোকেই জেনে থাকবেন যে, আন্দামানে অনেক দ্বীপগুলোতে ছোট-ছোট মানুষদের প্রজাতিরা বসবাস করে। অধিকাংশ দ্বীপে লোকেদের যাওয়া অবৈধ রয়েছে কারণ সেখানে গেলেই সেই প্রজাতিদের লোকেরা হামলা করে মেরে ফেলে। তাদেরও নিজের-নিজের ভাষা রয়েছে। সেই অধিকাংশ ভাষাগুলোকে এখন পর্যন্ত কেউই বুঝতে পারেনি। বিশ্বে এরকম অনেক দ্বীপ ও নির্জন

স্থানগুলোতে এরকম ধরণের মানব প্রজাতিরা উপস্থিত রয়েছে। যদি আজ থেকে ৫০০০ বছর পরে পরবর্তী মানুষ ২১ শতাব্দীর ইতিহাস লেখে আর তারা কোনো ছোট-মোট প্রজাতির চিত্রলিপি অথবা উৎপতাং শব্দ খোদাই করা পাথর পায়, তাকে দেখে যদি সেই ইতিহাসকার এটা বলতে থাকে যে, সম্পূর্ণ ইউরোপে এই লিপিটাই বলা হত তবে সেটা কি সত্যি হবে? একদমই না, কারণ আজ সংসারে অনেক ধরণের ভাষাই বলা হয়ে থাকে।

এইভাবে ইতিহাসকারদের দ্বারা সম্পূর্ণ ভারতের একটাই লিপি লেখাটা তাদের মূর্খতা তথা ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্ন জ্ঞান দর্শাচ্ছে। যখন প্রত্যক্ষ হাজার-হাজার বছর পূর্বের গ্রন্থ উপলব্ধ রয়েছে তাহলে তাকে না মেনে একটি দুর্বল কড়ি দ্বারা ইতিহাসের নির্মাণ করাটা কোথাকার বুদ্ধিমত্তা হল?

আসলে ব্রিটেনের ঈসাইরা (Christian) ভারতের ইতিহাসকে পুরোপুরিভাবে ভিন্ন করে লিখেছে। তাদের ভাষা হল ইংরেজি। আপনারা আগেই পড়েছেন যে, বিশ্বের অধিকাংশ প্রাচীন ভাষাগুলোর রচনা সংস্কৃত থেকে হয়েছে। এক ইউরোপীয় বিদ্বান লিখেছে যে -

"যে যে ভাষাগুলোর মধ্যে সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্ক দেখা যায় সেসব হল সেই মূল দেবদত্ত সাহিত্যেরই অঙ্গ যাকে এক মূলস্থান থেকে পড়ে নিয়ে মানব পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে বসবাস করতে থাকে।" (H.H. Wilson, 'Preface to Vishnu Puran', Oxford, 1837)

সজ্জন গণ, আমি সব সময়ই বলি যে, বিজ্ঞান কখনই আমাদের অথবা তোমাদের হয় না কিন্তু সকলের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু লোক নিজের ছোট ও নিচ্ বিচার ধারার কারণে বিবশ করে দেয় যে তাদের কড়া সত্যের দিকদর্শন করানো হোক, অন্যথা সকলেই জানে যে বেদ জ্ঞান হল সব মানুষদের জন্য তথা অনেক বিদেশী বিদ্বানরাও এটা মানে। এক বিদেশী লেখক লিখেছে যে, *"ঋগ্বেদ এটা কেবল আর্যদেরই নয় বরং সম্পূর্ণ মানবদের প্রাচীনতম গ্রন্থ।"* (M. Philip, 'The Teaching of the Vedas', p.213)

সুতরাং বিশ্বে বিজ্ঞান যতই উন্নতি করে থাকুক কিন্তু তা কেবল ভৌতিক উন্নতিই হবে, যার কারণে বিশ্বের অর্ধেকের অধিক জনবসতি পরিষ্কার জল তথা ভোজনের জন্য আশায় বসে আছে। আজ এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির কারণে প্রায় প্রত্যেক মানুষ সমস্যায় ঘিরে আছে তথা কোনো না কোনোভাবে এই বিষয়কে নিয়ে দুঃখী আছে। বেদ মানুষদের কেবল ভৌতিক জ্ঞান দেয়নি বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞানও দিয়েছে। আধ্যাত্মিক বিদ্যা ছাড়া ভৌতিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিনাশকারী হয়ে থাকে। যেরকম আকাশে উড়ন্ত বিমানের তেল সমাপ্ত হয়ে গেলে সেটা পরে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে সেরকম বিনা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ভৌতিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি মানব

সভ্যতার বিনাশই করবে। বেদ দ্বারা মানুষকে দেওয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান কোনটি? এই বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে লেখা হবে।

আমার মত হল যে, আজকের পর কেউ এটা বলতে পারবে না যে নাসা (NASA) আসার পর বিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয়েছে। এই জ্ঞান তো নাসা স্থাপনার কোটি কোটি বছর আগেই আর্যরা দিয়ে দিয়েছিল। আশা করি যে, মানুষ জাতিকে উন্নত ও সভ্য বানানোর হেতু সকলে বেদ ও আর্যদের মানব কল্যাণ হেতু দিয়ে থাকা আধ্যাত্মিক জ্ঞানকেও স্বীকার করবে। ঈশ্বরের সত্য উপাসক হয়ে দয়া, করুণা, প্রেম, মৈত্রীর মতো গুণগুলোর বৃদ্ধি করে মানবতাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিবে।

প্রাচীন বিজ্ঞানের এক ঝলক

বিজ্ঞানের এই প্রগতিতে প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের তথা গণিতজ্ঞদের অনেক বড় অবদান রয়েছে, যাদের গ্রন্থ পড়ার পরে পরবর্তীতে আসা বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্যগুলো থেকে অনেক পদার্থ বানিয়ে ফেলেছে। সেই প্রাচীন গ্রন্থের লেখকদের সংসার কখনও সত্য শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়নি বরং তাদের গরু-মোষ চরানো রাখাল বলে তাদের উপহাসই করেছে। এখানে বড়ই সংক্ষেপে আপনারা জানতে পারবেন যে, যেই বিজ্ঞানের উপর আজ বিশ্ব অহংকার করছে, তা হাজার-হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ করা রয়েছে। আর যদি উল্লেখ করা থাকে তার মানে সেই বিদ্যা কখনও না কখনও সংসারে অবশ্যই ছিল। উত্থানের সঙ্গে পতন নিশ্চিত, সুতরাং বিজ্ঞান যুগের পশ্চাৎ অন্ধকার যুগের আগমনও নিশ্চিত, এই বৈজ্ঞানিক উন্নতি সর্বদা থাকবে না। এরকম সময়ে মানুষদের মার্গদর্শন প্রাচীন শাস্ত্র দ্বারাই হয়ে থাকে। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রের বিষয়গুলোকে সমাজের মধ্যে সবসময় প্রচারিত করতে থাকা উচিত।

বলা হয়ে থাকে যে, বিদ্যুতের আবিষ্কারের পর বিজ্ঞান অনেক দ্রুত গতিতে উন্নতি করেছে। অনেক প্রকারের পদার্থ নির্মাণের কাজ বিদ্যুতের কারণেই হওয়া সম্ভব হয়েছে। আসলে বিদ্যুৎ হল এক উর্জা (শক্তি) আর আমরা সকলে জানি যে, পৃথিবীতে জীবন সূর্যেরই শক্তির কারণে সম্ভব হয়েছে। সুতরাং বিদ্যুৎ থেকে মানুষ অনেক প্রকারের লাভ নিতে পারে। বিদ্যুৎকে সংস্কৃতে বিদ্যুত্ বলে তথা বেদ হতে এই বিদ্যার বিস্তৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে থাকে। বেদে মন্ত্র এসেছে যে -

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত।

মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥

(ঋগ্বেদ মণ্ডল ৬, সূক্ত ১৬, মন্ত্র ১৩)

ভাবার্থ :"হে বিদ্বাম্সো, য়থা পদার্থবিদ্যাবিদো জনাঃ সূর্য়াদেঃ সকাশাদ্ বিদ্যুতম্ গৃহীত্বা..." অর্থাৎ - হে বিদ্বান লোকেরা, যেরকম পদার্থ বিদ্যার জ্ঞানী জন সূর্য আদির নিকট থেকে বিদ্যুৎকে গ্রহণ করে কার্যগুলোকে সিদ্ধ করে থাকে, সেই রকমই সব লোকেরা করো॥১৩॥ এই প্রকারে সূর্য আদি থেকে বিদ্যুৎ তৈরির নির্দেশ অনেকগুলো বেদ মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে, যথা ঋগ্বেদ ৬|৫৯|৮, ১|১৬৩|১০।

ইমমু ত্যমথর্ববদগ্নিম্ মন্থন্তি বেধসঃ।
য়মঙ্গকূয়ন্তমানয়ন্নমূরম্ শ্যাব্যাভ্যঃ॥

(ঋগ্বেদ মণ্ডল ৬, সূক্ত ১৫, মন্ত্র ১৭)

ভাবার্থ : "যে বিদ্বান লোক ভূমি, মহাকাশ, বায়ু, আকাশ তথা সূর্য আদি থেকে মন্থন করে বিদ্যুৎকে বের করে, সে অনেক কাজের সিদ্ধ করতে সমর্থ হবে।"

সুতরাং বিদ্যুতের গুরুত্ব সম্বন্ধে বেদের মধ্যে মানুষকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে আর এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিদ্যুৎ অনেক রকমের পদার্থ তথা স্রোত থেকে তৈরি করা যায় আর তা থেকে অনেক রকমের বড়-বড় কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। ঋগ্বেদের অন্য মন্ত্রতে (৪|৮|১০) বিভিন্ন পদার্থ থেকে বিদ্যুৎ তৈরির বর্ণনা করা হয়েছে। বেদে এটাও বলা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ দ্বারা কোন-কোন কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে।

হরী নু কম্ রথ ইন্দ্রস্য য়োজমায়ৈ সূক্তেন বচসা নবেন।
মো ষু ত্বামত্র বহবো হি বিপ্রা নি রীরমন্যজমানাসো অন্যে॥

(ঋগ্বেদ মণ্ডল ২, সূক্ত ১৮, মন্ত্র ৩)

ভাবার্থ : "য়ে বিদ্যুদ্রথম্ ন সাধ্নুবন্তি তে সর্বত্র রন্তুম্ রময়িতুম্ চ ন শক্নুবন্তি।" অর্থাৎ - যে বিদ্যুৎ দ্বারা রথকে সিদ্ধ করে না, সে সর্বত্র না স্বয়ং রম (ভ্রমণ) করতে পারে আর না অন্যকে রম (ভ্রমণ) করাতে পারে॥৩॥ এখানে বিদ্যুৎ দ্বারা চলমান রথের (গাড়ির) স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে বিদ্যুৎ দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারে তীব্র গতিতে চলমান বিমান, রথ তথা অন্য পদার্থগুলোর উল্লেখ বেদের অনেকগুলো মন্ত্রের মধ্যে এসেছে (যথা - ঋগ্বেদ ১|১৮২|২, ১|১৬৪|২)।

তৃষু য়দন্না তৃষুণা ববক্ষ তৃষুম্ দূতম্ কৃণুতে য়হ্বো
অগ্নিঃ। বাতস্য মেঠিম্ সচতে নিজূর্বন্নাশুম্ ন বাজয়তে হিন্বে অর্বা॥

(ঋগ্বেদ মণ্ডল ৪, সূক্ত ৭, মন্ত্র ১১)

ভাবার্থ : "য়দি মনুষ্যা বিদ্যুদ্বায়্বাদিয়োগবিদ্যাম্ জানীয়ুস্তর্হি তে দূতবদশ্ববদ্দূরম্ য়ানম্ সমাচারম্ চ গময়িতুম্ শক্নুয়ুঃ। অর্থাৎ - অর্থাৎ যে মানুষ বিদ্যুৎ আর বায়ু আদির য়োগ তথা সম্বন্ধকে জানে সে অনেক দূর বহন তথা সংবাদকে পৌঁছাতে পারে।।১১।।

এই মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বর মানুষদের বলেছে যে, বিদ্যুৎ তথা বায়ু আদির দ্বারা মানুষ তীব্র গতিতে চলমান বহন তথা দ্রুত খবর আদান-প্রদানকারী যন্ত্র (যেমন টেলিফোন ইত্যাদি) বানাতে পারে। এই বিষয়কে পুনঃ এক অন্য মন্ত্রে বলা হয়েছে যে -

প্রোথদশ্বো ন য়বসেऽবিষ্যন্যদা মহঃ সম্বরণাদ্ব্যস্থাত্।
আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ স্ম তে ব্রজনম্ কৃষ্ণমস্তি।।

(ঋগ্বেদ মণ্ডল ৭, সূক্ত ৩, মন্ত্র ২)

ভাবার্থ : "য়দা মনুষ্যা অগ্নিয়ানেন গমনম্ তডিতা সমাচারম্শ্চ গৃহ্ ণীয়ুস্তদেতে সদ্যঃ কার্য়াণি সাদ্ধুম্শক্নুবন্তি।" অর্থাৎ - যখন মানুষ অগ্নিয়ান দ্বারা গমন আর বিদ্যুত্ (বিদ্যুৎ) দ্বারা সংবাদ গ্রহণ করে তখন তারা শীঘ্র কার্যগুলোকে সিদ্ধ করতে পারবে।।২।।

এই মন্ত্র বেদের মহানতাকে প্রদর্শিত করছে। ঈশ্বর মানুষকে স্পষ্ট বলেছে যে, বিদ্যুৎ দ্বারা এরকম-এরকম পদার্থ বানানো যেতে পারে যার দ্বারা দূর দেশের সংবাদ অত্যন্ত শীঘ্র জানা যেতে পারে। আজ এরকমই একটা সাধন হল টেলিফোন। মোবাইল ফোন আদি আসার পরে বিদ্যুৎ দ্বারা চার্জ হতেই ইলেকট্রন আদি বিদ্যার দ্বারা শীঘ্র কথা বলা যেতে পারে তথা শোনা যেতে পারে। মানুষকে বুদ্ধি দেওয়াই হয়েছে এরজন্য যে, যেন সে নিজের সুবিধা তথা সুখে বৃদ্ধির জন্য ভালো-ভালো পদার্থ বানাতে পারে। কিন্তু মানুষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবে এই ভালো-ভালো পদার্থকে বানানোর পরেও সুখী নয় বরং দুঃখী হচ্ছে।

এক আমেরিকান বিদ্বান বলছে যে -

"We have all heard and read about the ancient religion of India. It is the land of the greatest Vedas, the most remarkable works containing not only religious ideas for a perfect life, but also facts which all the science has since proved true. Electricity, Radius, Electrons, Airships all seem to be known to the seers who found the Vedas."
(W. Willox, 'The sublimity of the vedas')

অর্থাৎ - "আমরা প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের সম্বন্ধে শুনেছি আর পড়েছি। এটা হল সেই মহান বেদের ভূমি যা অত্যন্ত অদ্ভুত, যেখানে না কেবল পূর্ণ জীবনের জন্য উপযোগী ধার্মিক তত্ব বলা হয়েছে বরং সেই তত্ত্বেরও

প্রতিপাদন করা হয়েছে, যাকে সমস্ত বিজ্ঞানগুলো সত্য প্রমাণিত করেছে। বিদ্যুৎ, রেডিয়াম, ইলেকট্রন্স্, বিমান আদি সব বিদ্যাগুলো বেদের দ্রষ্টা ঋষিদের জ্ঞাত ছিল।"

এমনটা নয় যে খালি বিদ্যুৎ ইত্যাদির বিদ্যা কেবল বেদে রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ অগস্ত্য সংহিতার মধ্যে বিদ্যুতের বিষয়ে অত্যন্ত বিস্তারে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। অগস্ত্য সংহিতার কিছু ভাগই আজ উপলব্ধ রয়েছে। অগস্ত্য সংহিতায় ইলেকট্রিক সেল (cell) বানানোর বিধির বর্ণনা করা হয়েছে।

সম্স্থাপ্য মৃণ্ময়ে পাত্রে তাম্রপত্রম্ সুসম্স্কৃতম্।
ছাদয়েচ্ছিখিগ্রীবেন চাদ্র অভিঃ কাষ্ঠপাম্সুভিঃ।।
দস্তালোষ্টো নিধাতব্যঃ পারদাচ্ছাদিদস্ততঃ।
সম্যোগাজ্জায়তে তেজো মিত্রাবরুণসম্ঞ্জিতম্।।

অর্থাৎ - একটি মাটির পাত্র নিন, সে পাত্রে তামার এক ধাতু (হালকা ধাতুর চাদর Copper Sheet) তথা শিখিগ্রীবা দিন। তারপর মাঝখানে ভেজা কাঠের বুরাদা (wet sawdust) লাগিয়ে তার উপর পারা (mercury) তথা দস্ত লোষ্ট (zinc) দিন। তারপর তারগুলোকে একে অপরের সঙ্গে মিলানোর পর মিত্রাবরুণশক্তির উদয় হবে।

এই সূত্রগুলোর আধারে নাগপুরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রধ্যাপক শ্রী পি০ পি০ হোলে নিজের মিত্রদের সহায়তায় পরীক্ষণ প্রারম্ভ করে তো সেখানে শিখিগ্রীবার অর্থ বুঝতে পারছিল না। সংস্কৃত কোষের মধ্যে দেখে জানতে পারে যে, শিখিগ্রীবা তো ময়ূরের গলাকে বলে। তারপর হোলে নিজের মিত্রদের সঙ্গে মহারাজা বাগে যায় আর Zoo কর্তৃপক্ষদের জিজ্ঞেস করে যে কোনো মরে যাওয়া ময়ূরের গলা পাওয়া যাবে? অস্তু, সেটা তো পাওয়া যায়নি কিন্তু শিখিগ্রীবার সঠিক অর্থ অবশ্য পাওয়া যায়। আসলে নতুন-নতুন ভাষা আসাতে প্রাচীন শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা এসেছে। পরে এক আয়ুর্বেদাচার্যকে হোলে তার সমস্যার কথা বললে তিনি হাসতে থাকেন আর বলেন যে, এখানে শিখিগ্রীবার অর্থ ময়ূরের গলা হবে না বরং তার গলার মতো রঙের পদার্থ কপারসলফেট হবে। ব্যাস্, তারপর দ্রুত এই সূত্রের আধারে ইলেকট্রিক সেল বানানো হয় আর মাল্টিমিটার দ্বারা তাকে মাপা হয়। তার অপন সার্কিট ভোল্টেজ ১.৩৮ ভোল্টেজ আর শর্ট সার্কিট কারেন্ট ২৩ মিলি অ্যাম্পিয়ার ছিল। পরে এই পরীক্ষণকে সার্বজনিক করে দেওয়া হয়েছিল।
অগস্ত্য সংহিতার এক অন্য সূত্রে এসেছে যে -

অনেন জলভম্গোস্তি প্রাণো দানেষু বায়ুষু।
এবম্ শতানাম্ কুম্ভানাম্ সম্যোগ কার্য় কৃত্স্মৃতঃ।।

মহর্ষি অগস্ত্য বলছেন যে, "যদি শত কুম্ভের শক্তির জলে প্রয়োগ করা হয় তবে জল তার রূপকে পরিবর্তন করে প্রাণ আর উদান বায়ুতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তারপর সেই উদান বায়ুকে কোনো পদার্থের মধ্যে (যেমন সিলিন্ডার আদি) একত্রিত করা হয় তবে তারথেকে অনেক ধরনের কার্য সিদ্ধি হবে।

সজ্জনগণ, প্রাণ বায়ু অক্সিজেনকে তথা উদান বায়ু হাইড্রোজেনকে বলে। জল এদেরই অণুর দ্বারা তৈরী হয়। মহর্ষি অগস্ত্য জলের অণুগুলোর আলাদা করার বিধি বলছেন আর হাইড্রোজেনের উর্জা (শক্তি) দ্বারা বিভিন্ন যন্ত্র চালানোর নির্দেশ দিচ্ছেন। আপনারা জানেন যে, হাইড্রোজেন দ্বারা সকল প্রকারের বাহন তথা বিমান আদি পর্যন্তকে চালানো যেতে পারে কিন্তু বৈশ্বিক পরিস্থিতি তথা রাজনীতির কারণে হাইড্রোজেনের থেকে কয়েক গুন অধিক প্রদুষণ ছড়ানোকারী জ্বালানির প্রয়োগ বাহনের জন্য বিশ্বের মধ্যে হচ্ছে। আমি বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের পুরুষার্থকে নমন অবশ্য করি কিন্তু এনারা যেই প্রাচীন লোকেদের গ্রন্থ তথা পরীক্ষণকে নিজের পরীক্ষণের আধার বানিয়েছিল আমি সেই ঋষিদের পূজ্য মনে করি আর প্রত্যেক মানবতাবাদীকেও তা মানা উচিত।

আজ বিশ্বের লোকে বিভিন্ন প্রকারের নতুন-নতুন যন্ত্র বানিয়ে বলছে যে, মানুষ কত মহান যন্ত্র বানিয়েছে। নতুন নতুন মেশিন বানানো হচ্ছে কিন্তু ভারতীয় দর্শন এই বিষয়ে অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তন করে থাকে। ঋষি ভাস্করাচার্য তার পুস্তক "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" -র মধ্যে অনেক প্রকারের উন্নত তথা বিস্ময়কর যন্ত্রের বর্ণন করেছেন। হাজার হাজার বছর পূর্বে স্বচালিত যন্ত্র তথা পারা আদি দিয়ে সময় দেখার জন্য সুন্দর ঘড়ি বানানোর বিধি পর্যন্ত বলা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত শিরোমণির মধ্যে যন্ত্রকে পরিভাষিত করতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রের ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করে আমি আশ্চর্যচকিত হয়ে যাই। সেখানে লেখা আছে যে -

অথ কিমু পৃথুতন্ত্রৈর্ধীমতো ভূরিয়ন্ত্রৈঃ,

স্বকরকলিতয়ষ্টের্দত্তমূলাগ্রদৃষ্টৈঃ।।

ন তদবিদিতমানম্ বস্তু য়দ্দৃশ্যমানম্,

দিবি ভুবি চ জলস্থম্ প্রোচ্যতেঽথ স্থলস্থম্।।৪০।।

এখানে ভাস্করাচার্য জী বলছেন যে, বুদ্ধিই হল বিশ্বের সবথেকে বড় যন্ত্র। বিভিন্ন বিদ্যার গ্রন্থকে পড়ে বিভিন্ন যন্ত্র তখনই বানানো সম্ভব হবে যখন বুদ্ধিও মানুষের সঙ্গ দিবে অর্থাৎ বিনা বুদ্ধিতে কোনো যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব নয়। আকাশস্থ গ্রহ, নক্ষত্র আদি সকলের মান (গতি, দূরত্ব আদি) বের করানো সম্ভব। আকাশ, পাতাল (ভূমি) তথা জলস্থ সব বস্তু হল দৃশ্যমান এইজন্য বুদ্ধি দ্বারা এসবের তথ্য বের করা সুলভ হবে, অর্থাৎ বুদ্ধিই হল গ্রহ গতি জ্ঞান আদি বিদ্যার জন্য এক মহান যন্ত্র।।৪০।।

এখানে ভাস্করাচার্য জী বিশ্বের সকল যন্ত্র তথা বিদ্যাগুলোকে জানা সুলভ বলেছেন যদি মানুষের বুদ্ধি ঠিক থাকে। এই বুদ্ধিকেই সর্বোচ্চ যন্ত্র বলেছেন কারণ বাকি সব যন্ত্র এরদ্বারাই বানানো হয়েছে তথা বানানো হয়ে থাকে। আজ মানুষ সকল যন্ত্রকে তৈরির শ্রেয় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদেরকে তো দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এই বুদ্ধির নির্মাতা সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের কেউ কথাই বলছে না। অধিকাংশ তো জানেই না যে এই বুদ্ধি যন্ত্রটিকে কে বানিয়েছে। নির্মাণকারী কোথায় থাকে? সে কিরকম? সে এইসব কিভাবে বানিয়েছে? এইসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমি যখন সব রিলিজিয়নের পুস্তক পড়ি তখন কেবল নিরাশাই আমি পেয়েছিলাম কারণ সেখানে বুদ্ধির বিরুদ্ধ, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ, সৃষ্টি নিয়মের বিরুদ্ধ গল্প - কাহিনীতে ভরে পরে আছে। অস্তু, এখন আপনারা এইসব প্রশ্নের ঠিক-ঠিক তার্কিক তথা বৈজ্ঞানিক উত্তর জেনে ফেলেছেন। এই বিদ্যা প্রত্যেক ঘরে তথা যুবক পর্যন্ত পৌঁছায় এই উদ্যেশ্য নিয়ে আমি এই পুস্তকটি লেখার পুরুষার্থ করেছি।

মহাভারতের যুদ্ধ আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে হয়েছিল। সেই সম্পূর্ণ যুদ্ধের বৃত্তান্ত সেই সময় "জয়" নামক পুস্তকে লিখে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঈসাই (ক্রিস্টিয়ান) ইতিহাসকারেরা ভারতীয় ইতিহাস বানানোর সময় মহাভারতের পুস্তককে ৮০০ থেকে ১০০০ খৃ০পূ০ আগের লেখা বলে দেয়। অস্তু, মহাভারতের পুস্তকের যা সময় সেটাও ঈসাইদের তথা ইহূদীদের বাইবেলের সব পুস্তকগুলোর (জবূর, তৌরেত, ইন্জীল) থেকেও অধিক প্রাচীন।

বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থগুলোর মধ্যে এক মহাভারতের সভাপর্বে একটি খুবই মজাদার ঘটনা দেখা যায় -

স কদাচিত্ সভামধ্যে ধার্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
স্ফাটিকম্ স্থলমাসাদ্য জলমিত্যভিশম্কয়া।।
(মহাভারত, সভাপর্ব, অধ্যায় ১০)

অর্থাৎ - একদিন দুর্যোধন ময় দ্বারা তৈরী সভা ভবনে ভ্রমণ করতে করতে স্ফোটিক মণিদ্বারা তৈরি স্থানে গিয়ে পৌছায়। তার স্থলটি (floor) জলের মতো দেখতে লাগছিল। চোখের দৃষ্টিতে এমন প্রতিত হচ্ছিল যেন সেটা জল, কোনো স্থল নয়। এইজন্য দুর্যোধন জলের আশঙ্কার কারণে বস্ত্র উপরে তুলে নেয়। পরে জানতে পারে যে এটা তো স্থলের ভিতর দিব্য দৃশ্য স্থাপিত করা হয়েছে।

আজও আপনারা দেখে থাকবেন যে, ঘরের স্থলকে (floor) পারদর্শী করে নীচ দিয়ে বিদ্যুতের তার অথবা সেন্সরের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কারুকার্য দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আমরা সেই স্থলের উপর দিয়ে হেঁটেও যেতে পারি। দূর্যোধন যখন সেই সভা ভবনে কিছু দূর সামনে যায় তো সে আবারও এক স্থানে জল দেখতে পায়। দূর্যোধন ভাবে এটাও দিব্য দৃশ্যই হবে। এইবারে সে সোজা জলে পা দেয় কিন্তু সেখানে

সত্যিই জল ছিল এইজন্য সে জলে পরে যায়। সেই মহলে কয়েকটি স্থলে এমন এমন দিব্য দৃশ্য লাগানো হয়েছিল যে আসল আর নকলকে জানতে পারা খুবই কঠিন ছিল।

এই উদাহরণ দ্বারা আপনারা বুঝতে পারছেন যে, হাজার হাজার বছর পূর্বে ভারতে কেমন কেমন ধরনের ভবন তৈরি করা হয়েছিল। যেভাবে ময় নির্মিত ভবন ছিল তা থেকে এটা স্পষ্ট জ্ঞাত হচ্ছে যে, বিদ্যুৎ দ্বারা অনেক ধরনের প্রয়োগ মানব সমাজ সর্বদা নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, কিছু সময় পর্যন্ত জ্ঞানের পরম্পরা কোনো কারণের জন্য কয়েক বার থেমে যায় কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যে তা পুনঃ প্রারম্ভ হয়ে যায় কারণ মানুষের কাছে বুদ্ধি নামক যন্ত্র রয়েছে, যার প্রয়োগ করে সে নতুন নতুন পদার্থ সর্বদা বানিয়ে থাকে।
বলার আবশ্যকতা হবে না যে, এরকম গূঢ় বিদ্যার জ্ঞান দাতা এই গ্রন্থ হাজার হাজার বছর পূর্বের যখন ইউরোপে কোনো প্রকারের খোঁজ প্রারম্ভই হয়নি।

এই কথাকে প্রফেসর ম্যাকডোনেল লিখেছে যে -
"In science too, the debt of Europe to India has been considerable. During the eight and ninth centuries, the Indians became the teachers in arithmetic and algebra of the Arabs, and through them of the nations of the West." (A.A. Macdonell, 'A History of Sanskrit Literature',p.424)
অর্থাৎ - "বিজ্ঞানেও ইউরোপের উপর অনেক ঋণ রয়েছে ভারতের। অষ্টম আর নবম শতাব্দীতে ভারতীয়রা অঙ্কগণিত আর বীজগণিতের বিষয়ে আরবদের অধ্যাপক ছিল তথা আরবের মাধ্যমে সেই বিদ্যা পশ্চিম (ইউরোপ) এর দেশগুলোতে আসে।"

গণিত বিদ্যা হল অন্য সকল ভৌতিক বিদ্যাগুলোর মূল। যেকোনো মাপ গণিত বিদ্যা দ্বারাই বের করা যেতে পারে অর্থাৎ সব সৃষ্টির নিয়ম গণিত বিদ্যা দ্বারাই জানা যায়। যেকোনো যন্ত্র গণিত বিদ্যা ছাড়া বানানো সম্ভব নয়। সকল বিশ্বপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক তথা ইতিহাসকার এটাই বলে যে, গণিত বিদ্যার জ্ঞান ভারত থেকেই সারা বিশ্বের মধ্যে ছড়ায়। এর সোজা অর্থ বের হল যে আজ যে বিজ্ঞানের উপর বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে তার আঁধারই হল ভারতীয় জ্ঞান। হাজার হাজার বছর পূর্বে ভারতের গণিত গ্রন্থগুলোকে দেখে সংসার আজও আশ্চর্যচকিত হয়ে যায়।

মহর্ষি ভাস্করাচার্য কৃত গণিতের গ্রন্থ "**লীলাবতী**" আজও বড় বড় গণিতজ্ঞদের কাছে আশ্চর্যের বিষয় হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের মধ্যে গণিতের এরকম বিদ্যা দেখে কিছু স্বার্থী ইংরেজ ইতিহাসকার এটির প্রাচীনতা কম করানোর জন্য কয়েকশত বছরের সময় কমিয়ে দেয়। কিন্তু তা সত্তেও যখন ইউরোপ আর বিশ্বে যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ আদির সামান্য তথ্যই ছিল তখন সূর্য সিদ্ধান্ত, লীলাবতী, আর্যভট্টের মতো

মহান গ্রন্থের মধ্যে গণিত, গ্রহের মাপ তথা দূরত্ব, গ্রহণ বিজ্ঞান আদির মতো গম্ভীর বিষয়ের সঠিক তথ্য উপলব্ধ ছিল।

ভাস্করাচার্যের পুত্রী লীলাবতীর বিষয়ে তো বলা হয় যে, সে গাছের পাতা পর্যন্ত গণিত বিদ্যার দ্বারা তার সংখ্যা বলে দিতো। গণিত বিষয়ে Mr. Colebrooke লিখেছে যে -
"The credit of the discovery of the principle of differential calculus is generally claimed by the Europeans, but is was known to the Hindus centuries ago as it has been referred to in various places by Bhaskaracharya." (H.T. Colebrooke, 'Classics of Indian Mathematics: Algebra, with Arithmetic and Mensuration, from the Sanskrit of Brahmagupta and Bhaskara'.) প্রায় ১১ বছর ভারতে থেকে এই গণিতজ্ঞ প্রাচীন ভারতীয় গণিতের উপর বিস্তৃত প্রকাশ ফেলেছেন।

মহাভারতের পশ্চাৎ লুপ্ত হয়ে যাওয়া বিজ্ঞান পশ্চিমে ১৬০০-১৭০০ খৃ০ তে প্রারম্ভ হয়েছিল অথচ ভারতে সেই বিজ্ঞান প্রায় ৫০০ খৃ০ তে প্রারম্ভ হয়েছিল। মহারাজা ভোজের সময়ে এমন এক ধরনের যন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল যা স্বচালিত হয়ে ঘুরে বেড়াতো আর একটি বিমানও তৈরি করা হয়েছিল যেটা আকাশ, পৃথ্বী তথা জলে চলতো, এই বিষয়কে বিমান বিদ্যার বিষয়ে ভালোভাবে অবশ্য পড়ে নিবেন। মহারাজা ভোজের বংশোজ ততটা যোগ্য ছিল না তথা সেসময় ভারতীয় রাজাদের মধ্যে নিজেদের বাদবিবাদের কারণে যুদ্ধ চলতে থাকে। এখন যুদ্ধ চলাকালীন কেই বা বিজ্ঞানে ধ্যান দিবে কারণ সম্পূর্ণ সামর্থ্য, ধন, বল, বুদ্ধি, সেনা, সাধন তো যুদ্ধেই লেগে থাকতো। এরপরেই আরব মুসলিমদের আক্রমণ প্রারম্ভ হয়েছিল। ধীরে ধীরে ভারতের স্থিতি খারাপ হয়ে যায়। ভারত এক গুলাম দেশ হয়ে যায় তথা একে গুলাম যারা বানায় মুসলমানরা সব বিদ্যার গ্রন্থগুলোকে জ্বালানো শুরু করে দেয়। নালন্দা তথা তক্ষশিলার মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তথা অনেক বড় বড় পুষ্টকালয়গুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সুন্দর ভবনগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। গুরুকুল পরম্পরাকে সমাপ্ত করে দেওয়া হয় যারফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবাহ ভারতে একদম থেমে যায়। মুসলিমরা ভারতে রাজ করার সময় কেবল ধনই লুটে নেয় কিন্তু দেশের উন্নতিতে কিছুই খরচ করেনি।

মুঘলের সম্মান শৌখিন দেখে ফ্রানসুয়া বর্নীয়ার লিখেছে যে -
"ভারতের বাদশাহ এত ভব্য জীবনযাপন করতো যে কয়েক দেশের রাজাদের খরচা মিলিয়েও এত খরচার সামনে কমে যাবে।" (ডা০ বর্নীয়ারের ভারত যাত্রা)

এই কারণে ইংরেজ কিছু মাত্রার বিজ্ঞান তথা বুদ্ধির বলে কিছু হাজার সৈনিকের বল হওয়ার পরেও ভারতে কব্জা করে বসে। পঞ্চতন্ত্রে একটা বাক্য আছে যে "বুদ্ধির্যস্য বলম্ তস্য" অর্থাৎ যার কাছে বুদ্ধি আছে তার কাছে বল আছে কারণ বুদ্ধি নামক যন্ত্র দ্বারা অনেক ধরনের যন্ত্র তৈরি করা যেতে পারে।

এই অভাগা ভারতে পুনঃ ঈশ্বরের কৃপা হয়েছে তথা এখন জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত নতুন নতুন উপলব্ধিগুলো ছুঁয়ে চলেছে। ভারত তার প্রাচীন বৈভব তথা গৌরবের দিশায় বেড়ে চলেছে। ভারতের ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক আদি সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ মানা হয়।

আসলে, বিশ্বের লোক ভারতকে বিজ্ঞানের উৎপাদক তথা প্রারম্ভকার তো মানছে কিন্তু ভারতীয় জ্ঞানের সময় কেবল দুই হাজার বছরের ভিতর সংকুচিত করার চেষ্টা করছে। একদিকে অর্ধেক সত্য বিশ্বে প্রচারিত করে দেওয়া হয়েছে যে ভারত শূন্যের জ্ঞান দিয়েছে। বাস্তবে, ভারতে কেবল শূন্যই নয় বরং গণিতের ১৯ অংকের সংখ্যাগুলোর জ্ঞান পর্যন্ত কোটি কোটি বছর থেকে রয়েছে।

বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন পুস্তক বেদে গণিত বিদ্যাকে বিস্তারভাবে দেখানো হয়েছে। বেদে লেখা রয়েছে যে -

ইমা মেऽঅগ্নऽইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বেকা চ দশ চ দশ চ
শতম্ চ শতম্ চ সহস্রম্ চ সহস্রম্ চায়ুতম্ চ চায়ুতম্
নিয়ুতম্ চ নিয়ুতম্ চ প্রয়ুতম্ চার্বুদম্ চ ন্যর্বুদম্ চ
সমুদ্রশ্চ মধ্যম্ চান্তশ্চ পরার্দ্ধশ্চৈতা মেऽঅগ্নऽইষ্টকা
ধেনবঃ সন্ত্বমুত্রামুষ্মিঁল্লোকে॥
(যজুর্বেদ ১৭/২)

অর্থাৎ - মানুষের উচিত যে, এক সংখ্যাকে দশবার গুণ দ্বারা দশ -
(১০), দশকে দশবার গুণ দ্বারা শত
(১০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা সহস্র
(১,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা দশ সহস্র
(১০,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা লক্ষ
(১,০০,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা দশ লক্ষ (১০,০০,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা কোটি (১,০০,০০,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা দশ কোটি (১০,০০,০০,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা অর্ব (১,০০,০০,০০,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা দশ অর্ব (১০,০০,০০,০০,০০০), তাকে দশবার দ্বারা গুণ দ্বারা খর্ব (১,০০,০০,০০,০০,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা দশ খর্ব (১০,০০,০০,০০,০০,০০০), তাকে দশবার

গুণ দ্বারা নীল (১,০০,০০,০০,০০,০০,০০০) তাকে দশবার গুণ দ্বারা দশ নীল (১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা এক পদ্ম (১,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা দশ পদ্ম (১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা এক শঙ্খ (১,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০), তাকে দশবার গুণ দ্বারা দশ শঙ্খ (১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০) এই সংখ্যাগুলোর সংজ্ঞা করা। এই এত সংখ্যা তো বলা হয়েছে কিন্তু অনেক চকারের হওয়ায় আরও অংকগণিত, বীজগণিত আর রেখাগণিত আদির সংখ্যাকে যথাযথ বুঝে নাও। যেরকম ভূ-লোকে এই সংখ্যা রয়েছে, ঠিক সেরকম অন্য লোকেতেও রয়েছে, যেরকম এখানে এই সংখ্যার দ্বারা গণনা করে আর কারিগর দ্বারা বেছে নেওয়া ইটে ঘরের আকার হওয়া শীত, উষ্ণ, বর্ষা আর বায়ু আদি থেকে মনুষ্যাদির রক্ষা করে আনন্দিত করছে, সেরকমই অগ্নিতে দেওয়া আহুতি জল, বায়ু আর ঔষধির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সকলকে আনন্দিত করে।।২।। (মহর্ষি দয়ানন্দ ভাষ্য)

বেদ থেকে নিয়েই "সূর্য সিদ্ধান্ত" আদিতেও এই সংখ্যারই বর্ণনা করা হয়েছে -

একম্ দশ শতম্ চৈব সহস্রমযুতম্ তথা।
লক্ষম্ চ নিয়ুতম্ চৈব কোটিরর্বুদমেব চ।।
বৃন্দম্ খর্বো নিখর্বশ্চ সঙ্গখঃ পদ্মশ্চ সাগরঃ।
অন্ত্যম্ মধ্যম্ পরার্ধশ্চ দশবৃদ্ধ্যা য়থাক্রমম্।।

এই দুই শ্লোকের শব্দে নাম দেখলে জানা যায় যে যজুর্বেদ মন্ত্রকেই কিছু সরল সংস্কৃতে লেখা হয়েছে। এইভাবে যজুর্বেদে গণিতের দুই প্রকারের সংখ্যার আবশ্যকতা বলা হয়েছে।

• প্রথম - ১,৩,৫,৭,৯,১১,১৩,১৫,১৭,১৯ থেকে ৩৩ পর্যন্ত তথা ক্রম হতে। এই মন্ত্রে গুণন, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল, ভাগজাতি, প্রভাগজাতি আদি যা গণিতের ভেদ রয়েছে, সেটা য়োগ আর অন্তর থেকেই উৎপন্ন হয়, এটা গণিতের গূঢ় বিদ্যা দেওয়া হয়েছে। (যজুর্বেদ ১৮|২৪)

• দ্বিতীয় - ৪,৬,৮,১২,১৬,২০,২৪,২৮,৩২,৩৬,৪০,৪৪,৪৮ তথা ক্রম হতে। এই মন্ত্রে সম সংখ্যার দ্বারা গণিতের অনেক ধরনের বিদ্যাকে শেখানো হয়েছে। (যজুর্বেদ ১৮|২৫)

এই মন্ত্র থেকেই অনিশ্চিত তথা অসংখ্যাতের মান বের করার জন্য বীজগণিতের বিদ্যা সংকেতের (অ+ক, অ-ক, অ÷ক) দ্বারা বের হয়। এইভাবে বেদ দ্বারা রেখা গণিত সম্বন্ধিত মন্ত্র তৃতীয় অধ্যায়ে আপনারা পড়েছেন। মহর্ষি দয়ানন্দ তো এই দুই মন্ত্র থেকে সব গণিতের বিদ্যা শেখার কথা বলতেন। ওনার কথা সেসময় সিদ্ধ হয় যখন বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা বৈদিক গণিত বের হয় যা অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে গূঢ় তথ্য শেখায়। আজ অনেক শিক্ষণ সংস্থানে বৈদিক গণিতকে স্বীকার করা হয়েছে কারণ এটি সময়কে বাঁচায়।

আসলে, যে বৈদিক গণিত আজ বিশ্বের কাছে আশ্চর্যের কেন্দ্র সেটা তো আমাদের প্রাচীন আচার্য্যদের গণিতের বিদ্যার একটা ছোট্ট উদাহরণ মাত্র। হাজার হাজার গ্রন্থ লুপ্ত হওয়ার পরেও সূর্য সিদ্ধান্ত, লীলাবতী, আর্যভট্ট, সিদ্ধান্ত শিরোমণির মতো গ্রন্থ দ্বারা প্রাচীন গণিত, জ্যোতিষ তথা সৃষ্টি বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরম্পরাকে জানা যেতে পারে।

সারা বিশ্ব মানে যে, বেদই হল সংসারের প্রাচীন পুস্তক আর বেদের মধ্যে গণিতের গূঢ় জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তথা অনেক বড় বড় সংখ্যার মানও দেওয়া হয়েছে। এতকিছু হওয়ার পরেও বুদ্ধির শত্রু এটা প্রচার করেছে যে, ভারত কেবল ০ (**শূন্য**) এর জ্ঞান দিয়েছে তাও আবার শত বছর পূর্বে। এত বড় মিথ্যা লোকের দ্বারা বলা হয়েছে। কেন? এর কারণটি খুবই সহজ যে, যদি সংসারকে বলে দেওয়া হয় যে প্রত্যেক বিদ্যা সংসারের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে আগে থেকেই ছিল তথা ভারতীয় বিদ্বান তারাও জানতো তাহলে বর্তমান বৈজ্ঞানীকদের উপর প্রশ্ন উঠতো যে, এনারা কোন আবিষ্কারটি করেছে?

যদি এই বিষয়ে আমি আমার নিজের মত দেই তবে নিশ্চিত রূপে বলবো যে, প্রাচীন সাহিত্যে সৃষ্টির সব নিয়ম, গণিত বিদ্যা আদি বিস্তারে দেওয়া আছে এরজন্য এর শ্রেয় তাদেরই প্রতি হওয়া উচিত। শেষ প্রায় ১৫০০ বছরের ভারতীয় ইতিহাস করুণ অবস্থার মাঝে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে কেটেছে এইজন্য প্রত্যেক বিদ্যা থিওরী রূপে হওয়ার পরেও ব্যবহারিক (Practical) জ্ঞান উন্নতি করতে পারেনি। এরজন্য ধন, সাধন, রাজা, ব্যবস্থা, তথা সমাজের অনুকূলতা আদি উপলব্ধই হতে পারেনি। পরিণামস্বরূপ ইউরোপের মধ্যে ধীরে ধীরে এই থিওরী থেকে প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষণ হওয়া প্রারম্ভ হয় আর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হওয়া শুরু হয়। এই কাজের জন্য সেসকল ইউরোপ আদি পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকদের শ্রেয় দেওয়া উচিত। আমি আগেই বলেছি যে, বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক সমস্ত সংসারের লাভের জন্য হয়ে থাকে।

প্রাচীন শাস্ত্রের গণিত জ্ঞানের উপর প্রফেসর ম্যাকডোনেল লিখেছেন যে -
"The great fact that the Indians invented the numerical figures used all over the world.
(A.A. Macdonell, 'A History of Sanskrit Literature', p.424)
অর্থাৎ - ভারতীয়রাই সারা বিশ্বে উপয়োগ কারক সংখ্যাত্মক পরিসংখ্যানের আবিষ্কার করেছে।

গণিত বিদ্যা প্রাপ্ত হলে পরেই ব্রহ্মাণ্ডের অনেক গূঢ় রহস্যের সমাধান করা যেতে পারে। প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে উচ্চ গণিতের বিদ্যা ছিল এই কারণে গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য, চন্দ্র, পৃথ্বী আদির সঙ্গে সম্বন্ধিত সৃষ্টির নিয়মেরও উচ্চ জ্ঞান উপলব্ধ ছিল। জ্যোতিষ বিদ্যায় (গ্রহ-নক্ষত্রের জ্ঞানে) ভারতে অনেক উন্নতি করেছিল। ভারতে প্রাচীন জ্যোতিষের উপর অনেক গ্রন্থ উপলব্ধ রয়েছে। আর্যভট্ট তো বৈদিক জ্যোতিষ দ্বারা বিভিন্ন গ্রহের সূর্য থেকে দূরত্বও মেপেছেন যা বর্তমান সংখ্যার মাপের সঙ্গে মিলে যায়।

ভারতীয় জ্যোতিষের প্রাচীনতার উপর বিদেশী বিদ্বান লিখেছেন যে -
"Astronomy of the Hindus has formed the subject of excessive admiration. As pointed out by Mr. Weber - Astronomy was practiced in India as early as 2780 B.C." (Acharya Vaidyanath Shastri, Science in the Vedas, 1970, p.187)

ভাবুন একবার, যেখানে ইউরোপে আজ থেকে ৩৫০ বছর পূর্ব পর্যন্তও খগোল বিজ্ঞানের মতো বিষয়ের উপর শোধ করার কারণে বৈজ্ঞানিকদের কারাগারে বন্দী করে দেওয়া হত অথবা মেরে পর্যন্ত ফেলা হত (পুস্তক - **गैलीलियों पर अत्याचार**), সেইখানে ভারতে আজ থেকে ৪৮০০ বছর পূর্বে খগোল বিজ্ঞানের উপর শোধ হচ্ছিল। বিভিন্ন গ্রহের গতি, গ্রহণ লাগা, গ্রহের ঘূর্ণায়মান, পৃথিবীর পরিধি তথা ব্যাস, প্রকাশ নিয়ে সম্বন্ধিত জ্ঞান আদি প্রত্যেক বিষয় বেদে তথা প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে।

প্রসিদ্ধ পারসী বিদ্বান ফর্দুন লিখেছেন যে, "The Veda is a book of knowledge and wisdom, comprising the book of nature, the book of religion, the book of prayers, the book of morals and so on. The word 'Veda' means wit, wisdom, knowledge and truly the Veda is condensed wit, wisdom and knowledge." (Philosophy of Zoroastrianism and comparative study of Religion)
অর্থাৎ - বেদ হল জ্ঞানের পুস্তক যেখানে প্রকৃতি, ধর্ম, প্রার্থনা, সদাচার ইত্যাদির বিষয় সম্মিলিত রয়েছে। বেদের অর্থ হল জ্ঞান আর বেদে সকল প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞান উপস্থিত রয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ ভারতের অশিক্ষিত লোকেদের কিছু গুরু ঘান্টাল জ্যোতিষের নামে ভয় দেখিয়ে ঠকিয়ে থাকে। জ্যোতিষকে হাত দেখা, কুণ্ডলী দেখা, মুখ দেখে ভবিশ্দ্বাণী বলার বিদ্যা বলে দেখানো হচ্ছে। কোথায় জ্যোতিষ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য জানা যেত আর এখন কোথায় জ্যোতিষের নামে ভালো মন্দ গ্রহের নাম করে লোকেদের মূর্খ বানানো হচ্ছে। এই বিষয়ে আমার কয়েক ঘন্টার ব্যাখ্যান উপলব্ধ আছে। (https://youtu.be/LH902nnLBsg)

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানকে কে না জানে। আজও সংসার বৈকল্পিক প্রাকৃতিক চিকিৎসাতে অধিক বিশ্বাস করে থাকে। ঋষিগণ বেদ থেকে আয়ুর্বেদের জ্ঞান বের করে মানুষের উপর অনেক বড় উপকার করেছে। হাজার হাজার বছর পূর্বের চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতার মতো আয়ুর্বেদের উপর আধারিত গ্রন্থ পড়ে এলোপ্যাথির লোকেরা আশ্চর্যে পরে যায়। আজ যে সার্জারি করা হচ্ছে সেই বিদ্যা ভারত থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে।

এই বিষয়ের উপর মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির পূর্ব গভর্নর বলেছেন যে - "European physicians learnt the science from the works of Arabic doctors; while the Arabic doctors many centuries before had obtained their knowledge from the works of great Indian physicians such as Dhanvantari, Charak, and Shushruta." [Lord Ampthill, at one time Governor of Madras Presidency, said in 1905. (Acharya Vaidyanath Shastri, 'What do the others say?')
অর্থাৎ - "ইউরোপীয়রা চিকিৎসা বিজ্ঞান আরবের ডক্টরদের কাছ থেকে শিখেছে আর আরবরা হাজার হাজার বর্ষ পূর্বে এই জ্ঞান মহান ভারতীয় চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে শিখেছে যারমধ্যে ধন্বন্তরী, চরক তথা সুশ্রুত আদির মতো বৈদ্য ছিলেন।"

কাজলী প্রান্ত যেটা মালাবারের নিকট ছিল সেখানকার রাজা খুবই শ্রেষ্ঠ ও অদ্ভুত বস্তু আকবরের জন্য পাঠিয়ে ছিল আর সেটা ছিল এক অন্য ধরনের ছুরি যেটা কারও গলা কাটার জন্য নয় বরং অনেক ধরনের রোগ থেকে বাঁচার অর্থাৎ চিকিৎসার জন্য ছিল। সেই ছুরিটিকে কাজলীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য ধাতুর বহু মিশ্রণ দ্বারা তৈরী করেছিল, যেন কারও শরীরে যদি কোনো ভাবে ফুলে যায় তবে ছুরিটিকে সেখানে ঘষলে পরে ফোলা সমাপ্ত হয়ে যায়। অন্য অনেক ধরনের রোগের হেতুতেও সেই ছুরিটি অদ্ভুত কাজ করতো। এটা খুবই মজাদার ও ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারে পরবর্তী অধ্যায়ে লেখা হবে।

বর্তমান এলোপ্যাথির মধ্যে কেবল দুটো জিনিসই মুখ্য রয়েছে। প্রথমত সার্জারি আর দ্বিতীয়ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ। এলোপ্যাথির মধ্যে যে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটা মানুষদের জন্য খুবই ঘাতক সিদ্ধ হচ্ছে। আমি যেখানেই কার্যক্রমে যাই লোকেদের সচেতন অবশ্যই করি যে, পরবর্তী সময় খুবই ভয়ংকর হবে। এলোপ্যাথিতে সব রোগ ঠিক করার হেতু অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথম কথা তো হল যে, এই অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের সংখ্যা সীমিত, আর নতুন ওষুধ পাওয়াই যাচ্ছে না। দ্বিতীয় কথা হল যে, আজ যে অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে তার প্রভাব মানুষের মধ্যে পড়ছে না অথবা পূর্বের থেকে কম পড়ছে।

ভাবুন একবার, অসুখ হওয়ার পর ওষুধ কাজ করছে না তাহলে কিরকম স্থিতি হবে। পরবর্তী সময় এরকমই হবে যে সাধারণ জ্বর হলেও এলোপ্যাথির ওষুধ কাজ করা বন্ধ করে দিবে।

আজ থেকে প্রায় ৬ বছর পূর্বে ছাপা একটি রিপোর্টে এটাই বলা হয়েছিল যে, "We are entering a postantibiotic era, where drug-resistant "superbugs" threaten our health and economy." (When Antibiotics Stop Working, What's Next?, 28th January 2014)
অর্থাৎ - অ্যান্টিবায়োটিক যুগ চলে যাচ্ছে আর আমরা পরবর্তী চরণে প্রবেশ করছি যেখানে ঔষধ প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া আদি আমাদের স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতিকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

আজ করোনার মতো ভাইরাস আদি সারা বিশ্বকে বুঝিয়েছে যে, অ্যালোপ্যাথির ওষুধ আদি অকার্যকর হয়ে গেছে। এই যুগে আসা রোগের উপর ওষুধের কোনো প্রভাব পড়ছে না। এমনকি যেসব ওষুধের জেনেটিক রূপে বল বাড়ানো হয়েছে সেগুলোও অকার্যকর হয়ে গেছে।

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনও অনেকবার এই বিষয়ে বিশ্বকে সচেতন করেছে। (WHO Report, 'The world is running out of antibiotics', 20th September 2017)

অধিকাংশ ডাক্তার আর হাসপাতাল অসুস্থ ব্যাক্তিকে অধিক থেকে অধিক ওষুধ বিক্রির চেষ্টা করে থাকে। ধীরে ধীরে সে ব্যক্তির মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এক ছোট্ট বাচ্চার সর্দি-কাশি তথা হালকা জ্বর হতেই তাকে ডাক্তার দ্রুত ঠিক করার চক্করে ওষুধের হাই ডোস দিয়ে দেয়। এরকম ডাক্তারের প্রতি লোকে অনেক প্রসন্ন হয়ে থাকে যে দেখলেন, আমাদের বাচ্চাকে সেই ডাক্তারটি কত তাড়াতাড়ি ঠিক করে দিল। এখন সেই বাচ্চাটির শরীরে কম পাওয়ারের অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করা ছেড়ে দিবে। আর যখন সেই বাচ্চাটি বড় হবে তখন তার শরীরে হাই ডোস (বেশি পাওয়ারের) ওষুধও কাজ করা ছেড়ে দিবে। সেই সময় সে অনেক অসহায় অনুভব করবে কারণ তার জন্য এর উপরের পাওয়ারের কোনো ওষুধই নেই। ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া তথা ভাইরাস আদি ধীরে ধীরে বেশি পাওয়ারের ওষুধের প্রতিরোধী হয়ে যায়। এখন যদি সেই ব্যক্তির কোনো অসুখ হয় তাহলে ওষুধ তার শরীরে কাজই করবে না। যেসব ডাক্তার ভালো হবে সে আপনাকে বলে দিবে যে, বাচ্চার সাধারণ সর্দি- কাশি তথা জ্বর আদি কিছু দিনের মধ্যে আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে, কারণ যখনই মানুষের শরীরে কোনো অসুখ আসে তখন শরীর আপনা-আপনিই অ্যান্টিবায়োটিক বানানো শুরু করে দেয় আর সেই রোগের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। কিছু দিনের মধ্যেই সে রোগকে ঠিক করে ফেলে।

এখানেই শেষ নয়, আমাদের শরীর একবার যেই রোগের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি বানিয়ে নেয় তারপর ভবিষ্যতে কখনও যদি আমাদের শরীরে সেই রোগটি আসে তবে আগে থেকে তৈরি অ্যান্টিবডি দ্রুত সেই রোগের সঙ্গে লড়াই করা শুরু করবে। ঈশ্বর শরীরের ভিতরেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সময় সব ডাক্তার এই কথাগুলো পড়ে থাকে কিন্তু ডাক্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তব্য ভুলে বসে। এমন নয় যে সব ডাক্তার এরকম, অনেক ডাক্টার ভালও আছে। একজন ডাক্তার আমার পরিচিত যার নাম ডা০ অজয় জৈন। নিজের হাসপাতাল হওয়ার পরেও লোকেদের ওষুধের সঠিক তথা সীমিত প্রয়োগ তথা তার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বলে থাকে। এরকম অনেক চিকিৎসককে আমি জানি যারা সমাজে সত্যের প্রচার করে লোকের স্বাস্থ্য বাঁচানোর কাজ করছে।

সুতরাং এখন বিশ্বের কাছে একটাই উপায় বাকি রয়েছে সেটা হল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ানো। এটা রোগ আসার পূর্বেই তৈরি হয়ে যায়। এখন করোনার সময়ে সকলে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানোর কথা বলছে কারণ এরকম ব্যক্তির উপর রোগ কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। আর এই বিষয়ে কেবল আয়ুর্বেদ পদ্ধতিই জোর দিয়ে থাকে। রোগ আসার পূর্বেই তাকে থামানোর জ্ঞান মানুষ আয়ুর্বেদ থেকে পেয়েছে। রোগ আসার পরও সেটিকে মূল থেকে ঠিক করার জ্ঞানও কেবল আয়ুর্বেদের মধ্যেই রয়েছে।

কিছু লোক বলে যে, আয়ুর্বেদ দ্রুত কাজ করে না। আসলে আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত হল কোনো রোগকে কিছু সময়ের জন্য চেপে রাখা নয় বরং তাকে পূর্ণতঃ ঠিক করা। তাছাড়া রোগও তো হঠাৎ করে আসেনি বরং ধীরে ধীরে কয়েক মাস অথবা বছরের অনিয়মিত জীবনশৈলীর কারণে এসে থাকে। সুতরাং তাকে ঠিক করতেও সময় লাগবে। যদি কেউ বলে যে সে আপনাকে একদিনে ঠিক করে দিবে তাহলে সে আপনাকে মূর্খ বানাচ্ছে। এরকম কেবল ঈসাই (ক্রিশ্চিয়ান) মিশনারী আদিবাসীদের মূর্খ বানিয়ে ধর্মপরিবর্তন করার জন্য করে থাকে।

দুর্ভাগ্যবত, আজ আয়ুর্বেদের নামেও অনেক দেশী-বিদেশী কোম্পানি বাজারে অনেক নতুন নতুন পদার্থ বানিয়ে ধন কামাচ্ছে। এইভাবে কিছু অশিক্ষিত লোক রাস্তার কিনারে সাঁপ আদির অশুদ্ধ বিষ নিয়ে আসল আয়ুর্বেদ লিখে লোকেদের ঠকাচ্ছে। মুসলিমরাও আয়ুর্বেদের বড় বড় কোম্পানি বানিয়ে ফেলেছে। আয়ুর্বেদের নামও ধীরে ধীরে মাটিতে মিশিয়েই ছাড়বে এই মুনাফাখোর লোকেরা। আমি কোনো ব্যাপারী (হিন্দু, মুসলিম, ঈসাই আদির) উপর প্রশ্ন তুলছি না কিন্তু এই শিক্ষা দিতে চাই যে, আয়ুর্বেদ কেবল কিছু ওষুধে সীমিত নয় বরং শুদ্ধ আচরণ, শুদ্ধ বিচার, নিয়মিত দিনচর্যা, শাস্ত্র অনুসারে ভোজন, পবিত্র জীবন, পরোপকার, যোগ-প্রাণায়াম, ঈশ্বরের উপাসনা আদির নাম হল 'আয়ুর্বেদ'। মহর্ষি চরক বলেছেন যে -

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।

প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থো ইত্য মিধীয়তে॥

(চরকসংহিতা)

অর্থাৎ - যার ত্রিদোষ (বাত্, পিত্ত, কফ), সপ্ত ধাতু, মল প্রবৃত্তি আদি শারীরিক ক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় হবে, সঙ্গে আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং মন প্রসন্ন স্থিতিতে হবে, তাকেই স্বাস্থ্ মনুষ্য বলা হয়।

আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি যে, বিশ্বে এমন কোনো রোগ নেই যাকে শুদ্ধ আয়ুর্বেদ দ্বারা ঠিক করা যাবে না। যারাই আমার এই পুস্তকটি পড়ছেন তারা আজ থেকেই আয়ুর্বেদকে সম্পূর্ণ রূপে জীবনে ধারণ করুক আর বাচ্চাদের ছোট মোটো অসুখে অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন না অথবা ডাক্তারকে বলে দিবেন যে, নিম্ন থেকে নিম্ন পাওয়ারের ওষুধই বাচ্চাকে দিবেন। আজ ভারত দেশে এই বিষয়ের উপর স্বামী রামদেব জী অনেক সচেতনতা ছড়িয়েছেন। ওনারই মার্গদর্শনে ভাই রাজিব দীক্ষিত জীও অনেক ব্যাখ্যা দ্বারা লোকের মাঝে সত্য তথ্য পৌঁছাইয়ে ছিলেন তথা আচার্য বালকৃষ্ণ জী আজও লোকের স্বাস্থ্য হেতু কাজ করে চলেছেন। এদের পূর্ব বৈদ্য আচার্য রামনারায়ণ শর্মা জী তথা স্বামী ওমানন্দ জীর মতো অনেক মহাত্মারাও আয়ুর্বেদের উপর পুরুষার্থ করেছিলেন।

প্রফেসর উইলসন লিখেছেন যে -

"Indian medicine dealt with the whole area of the science." (Acharya Vaidyanath Shastri, Science in the Vedas, 1970, p.191)

সারা বিশ্ব জানে যে, মানুষ শরীরকে পূর্ণ সুরক্ষিত করার উপায় তথা সমাধান কেবল প্রাচীন আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতেই রয়েছে। আয়ুর্বেদ যতই প্রাচীন হোক না কেন কিন্তু আজও ততই উপয়োগী তথা কার্যকর যতটা হাজার হাজার বছর পূর্বে ছিল। আয়ুর্বেদ হল একটি নির্দোষ বিদ্যা আর সর্বদা নবীনই থাকে। সম্পূর্ণ শরীরের শুদ্ধির উপায় যদি কোনো চিকিৎসা পদ্ধতিতে থাকে তবে সেটা কেবল আয়ুর্বেদেরই পদ্ধতি হবে। বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ তথা যন্ত্রের যত্ন তথা শুদ্ধি করতে হয় নয়তো সে যন্ত্র কোনো কাজের থাকে না। আপনারা আগেই পড়েছেন যে, বিশ্বের সবথেকে অদ্ভুত যন্ত্রটির নাম হল বুদ্ধি। আয়ুর্বেদের মধ্যে বুদ্ধির শুদ্ধি পর্যন্ত করার উপায় বলা হয়েছে কিন্তু লোকে কেবল শরীরের স্থূল অঙ্গের শুদ্ধি করার উপরেই অধিক ধ্যান দিয়ে থাকে। এইজন্য প্রাচীন ঋষিগণ শুদ্ধ বুদ্ধির বলে কেবল ভৌতিক উন্নতিই নয় বরং আধ্যাত্মিক উন্নতিও করেছিলেন। যখন আধ্যাত্মিক উন্নতিও ভৌতিক উন্নতির সঙ্গে চলে তখন মানুষ বিজ্ঞানের অনাবশ্যক খেলায় ভাগ নেয় না। কেবল অত্যন্ত আবশ্যক পদার্থ তৈরি করে থাকে তাও আবার আবশ্যকতা অনুসারেই।

এইজন্য ৫০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বের মধ্যে শুদ্ধ জলবায়ু ছিল তথা ক্যান্সার, এডস এর মতো রোগ হত না। ফ্রান্সুয়া বর্নীয়ার ভারত থেকে তার নিজের রাজাকে নিজের যাত্রা বৃত্তান্ত পাঠিয়ে লিখেছে যে -
"এখানকার লোকেদের সেই রোগ খুবই কম হয় যেটা আমাদের দেশে প্রধানত হয়ে থাকে আর যদি বা অভাগ্যবশত হয়েও যায় তবে সেটা তেমন ভয়ংকর হয় না যেমনটা আমাদের ওখানে হয়ে থাকে।"
(বর্নীয়ারের ভারত যাত্রা, পৃষ্ঠ ১৮৯)

যখন থেকে ভারতের মধ্যে ইউরোপের লোক আসে তথা এখানে কলোনি বসায় তখন থেকে প্লেগ, ম্যালেরিয়া আদির মতো রোগ ভারতে ছড়াতে থাকে। অ্যালোপ্যাথির বিকাশের জন্য ভারতের মতো দেশগুলোতে ইউরোপীয়রা অনেক ধরনের পরীক্ষণও করে। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ওষুধ মানুষের উপর পরীক্ষণ করার কারণে ভারতে গ্রামের পর গ্রাম নষ্ট হতে থাকে। ষড়যন্ত্র করে ছড়ানো হয় এরকম রোগের জন্য আয়ুর্বেদে সেরূপ পরিস্থিতিতে কোনো উপায় ছিল না আর না ছিল পরীক্ষণের জন্য বেঁচে থাকা কোনো গুরুকূল। গুরুকূল ব্যবস্থাকে আগেই ইংরেজরা (ঈসাইরা) ধ্বংস করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় অ্যালোপ্যাথির দিশায় লোকেদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ইউরোপীয়রা সাহিত্য, সংবাদপত্র, পত্রিকা, আদির মাধ্যমে প্রচার করা শুরু করে দেয়। অ্যালোপ্যাথির উপর লুটের ধনে কয়েক আরব ধন খরচা করে সেখানে আয়ুর্বেদের উপর এক হাজারও পর্যন্ত খরচা করেনি। পরিণামস্বরূপ ভারতের মধ্যে আজ ২টি ক্যান্সারের ট্রেন চলে। প্রত্যেক তৃতীয় ব্যক্তি গম্ভীর রোগে আক্রান্ত। আমার নিশ্চিত মত হল যে, আজ যদি এই রাষ্ট্র না জাগে তবে ভবিষ্যতে কখনও সুখপূর্বক ঘুমাতেও পারবে না।

প্রাচীন যাত্রার সাধন

কিছু লোক মনে করে যে, মানুষ এই প্রথমবার বিজ্ঞানের চমৎকারের কারণে তীব্র গতিতে চলমান যাত্রার সাধন তৈরি করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, সেই লোকেরা সংসারের প্রাচীন সাহিত্যের এক ছোট্ট টুকরোও পড়ে দেখেনি। যদি পড়তো তাহলে এরকম বিভ্রান্তকর কথা বলতো না আর প্রাচীন লোকেদের পুরুষার্থের অপমানও করতো না। যাত্রার সাধনের পূর্বে বেদে তিন প্রকারের মার্গ (পথ) বানানোর বর্ণনা করা হয়েছে।

য়ে তে পন্থানো বহবো জনায়না।
রথস্য বর্ত্মানসশ্চ য়াতবে।।
(অথর্ববেদ মণ্ডল ১২, সূক্ত ১, মন্ত্র ৪৭)

অর্থাৎ - তিন প্রকারের মার্গ তৈরি করা উচিত। প্রথম - জনায়ন, দ্বিতীয় - রথবর্ত্ম আর তৃতীয় - অনোবর্ত্ম।
- জনায়ন অর্থাৎ এই পথে কেবল মানুষই চলতে পারবে।
- রথবর্ত্ম অর্থাৎ এই পথে কেবল রথই (তীব্রর গতিতে চলমান সাধন) চলতে পারবে।
- অনোবর্ত্ম অর্থাৎ এই পথে কেবল গাভী, ছাগ আদিই চলতে পারবে।

এই প্রকার মার্গের বিভাজন হল পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথা লাভদায়ক। এইভাবে তীব্র গতিতে চলমান যাত্রীদের থেকে ধীর গতিকারী অথবা পায়ে হেঁটে চলাদের ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা কম হবে। বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন গন্থের মধ্যে এই প্রকারের পথের বিভাজনকে পড়ে আপনি আশ্চর্যচকিত তো নিশ্চয়ই হয়ে যাবেন। আমি যখন ইউরোপে যাই তো তখন আমি দেখি যে, যেমনটা বেদের মধ্যে ব্যবস্থা বলা হয়েছে সেই লোকগুলো নিজেদের জন্য ঠিক সেরকমই ব্যবস্থা বানিয়েছে। পায়ে হাঁটার জন্য একটি অন্য পথ বানিয়েছে। তারসঙ্গে সাইকেল ও ধীর স্কুটার চালকদের জন্য পথ রয়েছে আবার তারসঙ্গে গাড়ী চলার জন্য অন্য পথ রয়েছে। এই প্রকারের ব্যবস্থা করার জন্য তথা নিয়ম বানিয়ে তার পালন করার জন্য জনহানি অত্যন্ত ন্যুন হয় তথা ভীড়ও একত্রিত হয় না।

বেদে বলা হয়েছে যে -

ক্রীळম্ বঃ শর্ধো মারুতমনর্বাণম্ রথেশুভম্।
কণ্বা অভি প্র গায়ত।।

(ঋগ্বেদ মণ্ডল ১, সূক্ত ৩৭, মন্ত্র ১)

অর্থাৎ - হে বিদ্বানগণ! তোমরা বায়ুর দ্বারা বলকে তৈরি করে বিনা ঘোড়ার রথ দ্বারা ক্রিয়ার জন্য বিশেষ সাধন তৈরি করো।

কিছু লোক রথ শব্দের কেবল এটাই তাৎপর্য নিয়ে নেয় যে যার সঙ্গে ঘোড়া যুক্ত থাকে। বাস্তবে রথ শব্দটি স্থান ও স্থিতিনুসার সকল প্রকারের তীব্র গতিতে চলমান বাহনের জন্য প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এখানেই শেষ নয়, বেদের মধ্যে তো বিদ্যুৎ দ্বারা চলমান রথয়ানেরও স্পষ্ট বর্ণন রয়েছে।

যজুর্বেদে লেখা আছে যে, "বায়ুর গতি তথা বিদ্যুতের দীপ্তি দ্বারা যুক্ত রথকে প্রাপ্ত হয়ে তথা দেশ-দেশান্তরে গিয়ে প্রসিদ্ধ হও।" (যজুর্বেদ ৯|৮)

এছাড়াও একই রথে শত-শত মানুষ বসে যাত্রা করার রথের বর্ণনা বেদের মধ্যে করা হয়েছে -

অনু ত্রিশোকঃ শতমাবহন্নৃন্ কুত্সেন রথো য়ো অসত্ সসবান।

(অথর্ববেদ কাণ্ড ২০, সূক্ত ৭৬, মন্ত্র ২)

অর্থাৎ - যে তিন প্রকারের (বিদ্যুৎ, সূর্য, অগ্নি) প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত রথ হবে সেখানে শত শ্রেষ্ঠ পুরুষদের নিয়ে আসবে তথা নিয়ে যাবে।

বাস্তবে সত্য আসলেই খুব কড়া তথা আশ্চর্যজনক হয়ে থাকে। বেদের মধ্যে এরকম উচ্চ বিদ্যার শিক্ষাকে জানার পর আপনি নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন কারণ এর আগে কখনও এই সত্য কেউ বলেনি তথা আপনি না কোথাও পড়েছেন আর না শুনেছেন। অথর্ববেদের এই মন্ত্রের মধ্যে শত-শত শ্রেষ্ঠ লোকেদের একটি যন্ত্র দ্বারাই চলমান রথে যাত্রা করার বর্ণনা এসেছে। আসলে শত লোকেদের এক সাধারণ ঘোড়ার রথে একত্রে যাত্রা করা সম্ভব নয় আর যদি ঘোড়ার রথ লম্বা ও বিশাল হয় তবে তার পথে নিয়ন্ত্রণই অসম্ভব হয়ে যাবে। এরদ্বারাও আপনি বুঝে যাবেন যে রথ (মোটর গাড়ী) তীব্র গতিতে চলমান রেলগাড়ী তথা সাধারণ গাড়ীকে বলে।

এটা তো কথা হল ভূমিতে তীব্র বেগে চলমান সাধনের, এখন কথা হবে বায়ুতে চলমান সাধনের। মহর্ষি দয়ানন্দ বেদ ভাষ্যে লিখেছেন যে, **"শব্দায়মানান্ বিমানান্"** অর্থাৎ শব্দ করা বিমান। যেসময় মহর্ষি দয়ানন্দ এই কথা লিখেছিলেন সেসময় তো বিমান আদি ছিলই না আর এ. ও. হ্যুমের মতো বিদেশী লোক তো মহর্ষি দয়ানন্দের উপহাস পর্যন্ত উড়াতো। যখন আপনি বিমান শাস্ত্র পড়বেন তখন জানতে পারবেন যে বিমানের ভিন্ন-ভিন্ন গতির তথা মার্গের নির্ধারণও প্রাচীন ঋষিগণ করে ছিলেন যেন বায়ুতে দুর্ঘটনা আদি হওয়ার থেকে বাঁচা যেতে পারে। বিমানের গতির যথা - চলন, কম্পন, উর্ধ্বগমন, অধোগমন, মণ্ডল, চক্রগতি, ঘুমগতি, বিচিত্রগতি, অনুলোমগতি, বিলোমগতি, দক্ষিণগতি, তির্যকগ্গতি আদি করা হত। আকাশে বিমানের পাঁচটি মার্গ বলা হয়েছিল যাদের নাম রেখাপথ, মণ্ডল, কক্ষ্য, শক্তি, কেন্দ্র ছিল।

বিমান চালকের গুণ, পোশাক, তথা ভোজন আদিরও বিশেষ নিয়ম রাখা হয়েছে। "লোহতন্ত্র, দর্পণপ্রকরণ, শক্তিতন্ত্র" আদি প্রায় ১০০ প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখও করা হয়েছে যেগুলো এখন উপলব্ধ নেই। সম্ভবতঃ ইউরোপ বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সংগ্রহালয়ের মধ্যে এরমধ্যে কিছু গ্রন্থ অবশ্যই হতে পারে। প্রায় ৩৬ আচার্যগণের সূচিও দেওয়া হয়েছে। বিমানের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের নতুন-নতুন যন্ত্র তৈরি করে রাখার কথা বলা হয়েছে। বিমানের স্বয়ং রক্ষা হেতু তথা শত্রুর উপর প্রহার করার হেতু অনেক প্রকারের যন্ত্রের নাম তথা কার্য বলা হয়েছে। আকাশে যুদ্ধ করার উপায়ও বলা হয়েছে। কল্পনা করুন বিমান বিদ্যা কতই না উচ্চ অবস্থা পর্যন্ত এক সময়ে পৌঁছে থাকবে। এরকম অদ্ভুত প্রাচীন বিমানের গ্রন্থ থাকার পরেও কে বলতে পারে যে বিজ্ঞান এই প্রথমবার উন্নতির শিখর ছুঁয়েছে। বিমান বিদ্যার প্রাচীন ইতিহাস আপনাকে নিশ্চিত রূপে আশ্চর্যচকিত করতে পারে।

উড়ো জাহাজ - বিমান বিদ্যার সম্পূর্ণ ইতিহাস

শেষ এক দশক থেকে প্রাচীন ভারতীয় উড়ো জাহাজ টেকনিকে ভারতীয়দের মধ্যে জ্ঞান প্রাপ্ত করার রুচি বেড়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে বিস্তারে তথ্য তথা বিমান শাস্ত্র আদির মতো প্রাচীন গ্রন্থ সুলভ নেই। এই নিবন্ধের মধ্যে কোনো এদিক সেদিকের তথ্য নেই, বরং অত্যন্ত বিস্তারে ইতিহাস ও পুস্তকের অধ্যয়ন করে অমূল্য প্রাচীন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয় অত্যন্ত গভীর তথ্যের তথা তথ্যের দ্বারা সম্পূর্ণ ভরে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ এই বিষয়ের এত বিস্তৃত নিবন্ধ কোথায় উপলব্ধ নেই।

নষ্টে মূলে নৈব ফলম্ ন পুষ্পম্।।

যখন বৃক্ষের মূলই কেটে ফেলা হয় তো ফল-ফুল কোথা থেকে হবে?

উড়ো জাহাজের আবিষ্কারকে বিজ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট দান মানা হয়ে থাকে। এই আবিষ্কার মানুষকে দাঁতে আঙ্গুল চিপে ধরতে বিবশ করে দেয়। আজ সারা বিশ্ব স্বীকার করে যে, ১৭ ডিসেম্বর ১৯০৩ - এ রাইট ব্রাদার্স উড়ন জাহাজ তৈরি করে প্রথমবার উড়িয়ে ছিল। দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ ভারতীয়ও বলে থাকে আর মানে যে এই বিদ্যা হল পশ্চিমের দান। প্রিয় পাঠক, এরকম করা ইতিহাসের সবথেকে বড় মিথ্যা হবে।

পোঁতানো মরাকে তুলে কি লাভ?

আজ যখনই কেউ প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান/বিজ্ঞান ও সমৃদ্ধির কথা বলে তখন সেখানেই ভারতীয় বলে দেয় যে "কেন পোঁতা মরাকে তুলছেন?" সুতরাং এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রারম্ভ করার পূর্বে এর উত্তর দেওয়াটা অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে যায়।

"আজকের জন্য বাঁচো", "কে কালকে দেখেছে", "যা গেছে তা গেছে" - এরকম ধরনের বক্তারাই ইতিহাস থেকে সবার অধিক লাভ নিয়ে থাকে। মানুষ ইতিহাসে ঘিরে রয়েছে, ভরে রয়েছে। আমরা ছবি তুলি, ভিডিও বানাই, কিন্তু কেন? কারণ আমরা আমাদের ইতিহাসকে সুরক্ষিত রাখতে চাই। আমি দেখেছি কয়েকবার গভীর খোঁজের জন্য মৃতকেও তুলে নেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের প্রত্যেক কর্ম ভূত হয়ে যায় কিন্তু তার ফল ভবিষ্যতেই পাওয়া যায়।

চাকরির প্রত্যেকটি দিন ভূত হয়ে যায় কিন্তু বেতন ভবিষ্যতে পাওয়া যায়। যদি আমরা চাকরি ঠিক মতো না করে থাকি, তাহলে বেতনে সমস্যা আসবে অথবা অপমানিত হতে হবে। কিন্তু যদি আমাদের ভূত ভালো হয় তবে কোনো সমস্যা হবে না।

একটি ছোট্ট বাচ্চা যদি দুদিন বিদ্যালয়ে না যায় তবে তৃতীয় দিনে তার ভয় লাগবে কিন্তু যদি তার ভূত ভালো থাকে, সে বিদ্যালয় থেকে কোনো অবকাশ (ছুটি) নেয়নি, গৃহকার্য ঠিক মতো করেছে তাহলে তার ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ে যেতে ভয় লাগবে না। সে প্রসন্নতাপূর্বক বিদ্যালয়ে যাবে তথা পুরোপুরি মন দিয়ে আগামী কার্য করতে থাকবে।

এরকমই এক রাষ্ট্রের সঙ্গে হয়ে থাকে। ইতিহাস আমাদের বর্তমানে মার্গদর্শন করায় তথা এটা আমাদের স্বর্ণিম ভবিষ্যতের আধার। ইতিহাসকে জেনেই আমরা আমাদের পূর্বজদের করে থাকা ভুলকে পুনরাবৃত্তি থেকে বাঁচতে পারি আর যেসব গৌরবপূর্ণ কার্য আদি হবে তার অনুসরণ করে সুখ-সমৃদ্ধির দিকে উন্নতি করতে পারি। এইজন্য প্রাচীন সময়ের রাজাদের প্রতিদিন ১ ঘন্টা ইতিহাস শোনা অনিবার্য ছিল।

বিশ্ব ইতিহাসের দুটি বড় ঘটনা

৪৯৩ খৃ০ পূ০ য়ূনানের কাছে ফারস পরাজিত হয়েছিল। ফারসের সম্রাট ডেরিয়স তার নিজের চাকরকে বলে যে, সে যেন প্রতিদিন তার সামনে এসে বলে যে *"মালিক এথেন্স বাসীদের স্মরণে রাখবেন"*, এরপর ফারস য়ূনানের কাছে যুদ্ধে জিতেছিল।

প্রায় ১৭০০ বছর যাবৎ ইহূদীদের উপর ঈসাইরা আর তারপর মুসলিম আদিরা অত্যাচার করে। এদের নিজের মুখ্য পবিত্র স্থল জেরুজালেমকে ছেড়ে এর-ওর দ্বারে ঘুরে ফিরতে হত। ইহূদীরা যখনই নিজেদের সঙ্গে মিলিত হত তখন বলতো *"আগামী বছর জেরুজালেমে দেখা হবে"*।আজ জেরুজালেমের (ইজরায়েলের রাজধানীর) উপর ইহূদীদের কব্জা রয়েছে।

অর্থাৎ যারাই নিজেদের ইতিহাসকে স্মরণ রেখেছে তারা তাদের হারিয়ে যাওয়া গৌরব, অধিকার আর ক্ষমতা প্রাপ্ত করেছে তথা স্বাভিমানের সঙ্গে নিজেদের ব্যবস্থা চালিয়ে বিশ্ব স্থলে ছেয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতীয় লোকজন বৈশ্চিক ঘটনার আর ইতিহাসের প্রতি চোখ বুঁজে বসে আছে। এখন ঘুমিয়ে পড়া

ব্যক্তিকে তো জাগানো যেতে পারে কিন্তু যে ঘুমানোর নাটক করছে তাকে কে জাগিয়ে তুলবে? এখনও সময় আছে যে প্রত্যেক ভারতীয় ধর্ম তথা ইতিহাসের সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত করে নিজের জীবন সফল বানাতে দিন-রাত পরিশ্রম করুক যেন ভারত রাষ্ট্র পুনরায় বিশ্বগুরু হয়। কেবল জ্ঞান বিজ্ঞানেই নয় বরং সংস্কারেও ভারতীয় জনগণ বিশ্বের সম্মুখ এক উদাহরণ প্রস্তুত করুক।

ভারতীয়দের সোনার পাত্র হাতে ভিক্ষা চাওয়া ভিক্ষুক বলা হয়ে থাকে। বাস্তবে সোনার পাত্রে ভিক্ষা চাওয়া হয় না বরং দান দেওয়া হয়। ভারতীয়রা সোনার পাত্রে সংসারকে অমূল্য হীরা মোতি দানে দিয়েছে। অর্ধেক বিশ্বের জনগণ ভারত থেকে লুট করা ধন সম্পদের ক্ষমতার উপর আজও নিজেকে সভ্য তথা সমৃদ্ধি বলছে।ভারত থেকে সকলে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়েছে, সোনা-রূপা, হীরা-মোতী নিয়েছে আজ সেই দেশকে অপমান করাই হল কৃতঘ্নতা।

মিত্রগণ, সংসারে ধন-সম্পদের থেকেও বড় হল সম্মান। ভারতকে পুনঃ শিখরে পৌঁছানোর একমাত্র মার্গই হল নিজের দেশ, ধর্ম, জাতি তথা ইতিহাসকে জানা। সারা বিশ্ব আজ ভারতকে আশার দৃষ্টিতে দেখছে যে ২১ তম শতাব্দীতে এটি মানবতার সুখ, শান্তি তথা সমৃদ্ধির পথ দেখাবে। এরকম সময়ে ওম্ তথা ঈশ্বরীয় জ্ঞানের গুরুত্ব আবশ্যকতা রয়েছে। এই পুস্তকটি প্রত্যেক যুবকদের সত্য বৈদিক ধর্মের দিশায় নিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করবে।

বিমানের ইতিহাস সর্বপ্রথম কে বানিয়ে ছিল?

১৮ তম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম "মানুষ বিমান নির্মাণ করে উড়তে পারবে" এই কথাটি বলেছিলেন আর্য সমাজের সংস্থাপক মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী। বর্তমান সময়ে তিনিই প্রাচীন উড়োজাহাজ বিজ্ঞানের বিষয়কে জনসামান্যের বিষয় করেন। তিনি শীঘ্র কার্যক্রম করার সঙ্গে প্রচুর মাত্রায় প্রমাণ দেখানোর সঙ্গে প্রাচীন ভারতে বিমানের ইতিহাস বলতে শুরু করেন। শত-শত বছরের গুলামীর শিকলে বাঁধা হিন্দু জাতিতে স্বয়ং নিজের স্বর্ণিম ইতিহাসের উপর সংশয় হচ্ছিল। তারা সবকিছু ইউরোপের দান মানতে শুরু করেছিল। লোকেরা নিজেদের ধর্ম তথা ইতিহাসকে দিন-হীন ভাবা শুরু করেছিল।

যখন রেলগাড়ী আবিষ্কারের নামে কিছু গুলামী মানসিকতার ভারতীয় লোক ইংরেজদের প্রশংসা করতো তখন স্বামী দয়ানন্দ জী ১০ আষাঢ় সম্বত ১৯৩২ (১৮৭৪) ঘোষণা করে বলেছিলেন যে -
"উপরিচর নামক রাজা ছিল। সে সবসময় মাটি স্পর্শ না করে বায়ুর মধ্যেই ঘুরে বেড়াতো। আগে যেসব লোকেরা লড়াই করতো, বিমান তৈরির বিদ্যা তাদের ভালোভাবে বিদিত ছিল। আমিও এক বিমান রচনার পুস্তক দেখেছি। ভাই, সেই সময় দরিদ্রের ঘরেও বিমান ছিল (যেমন আমেরিকাতে আজ প্রায় সকলের কাছেই গাড়ি রয়েছে)। *তো ভাবুন যে সেই ব্যবস্থার সম্মুখ এই রেলগাড়ির প্রতিষ্ঠা কি হতে পারে?"* (পূনা প্রবচন, পৃষ্ঠ ৪২-৪৩ তথা মহর্ষি দয়ানন্দ নির্বাণ শতী গ্রন্থ, ১৯৮৩, পৃষ্ঠ ৯৪)

এ. ও. হ্যুম যিনি পরবর্তীতে ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫ তে মুম্বাইতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের স্থাপনা করেছিলেন। তিনি স্বামী দয়ানন্দের উপহাস করে বলেছিলেন যে *"ব্যক্তির উড়া বেলুনের মধ্যেই সীমিত হতে পারে। যান তৈরি করে পাখির মতো উড়ে বেড়ানো তো কেবল স্বপ্নতেই হওয়া সম্ভব। স্বামীজির মাথা ঠিক নেই।"* (দেশভক্তদের বলিদান, আমাদের বিরাসত তথা মহর্ষি দয়ানন্দ নির্বাণ শতী গ্রন্থ)

আজ ১৩৩ বছর কংগ্রেসের স্থাপনার হয়ে গেছে। এ. ও. হ্যুমের স্থান রাহুল গান্ধী নিয়ে নিয়েছে কিন্তু বিচারে আজও কোনো পার্থক্য নেই। অস্তু, যখন বিমান নির্মাণ হয় তখন একদিন উদয়পুরে এ. ও. হ্যুম স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জীর কাছে তার নিজের উপহাসের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন কারণ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সেসময় জীবিত ছিলেন না।

বিমানের প্রথম আবিষ্কারকের বিষয়ে উত্তর দেওয়ার সঙ্গে স্বামী দয়ানন্দ জী বলেছিলেন যে -
"কলা-কৌশলের ব্যবস্থাকারক বিশ্বকর্মা নামক এক পুরুষ ছিলেন। বিশ্বকর্মা হল পরমেশ্বরেরও একটি নাম আর একজন শিল্পকারেরও ছিল। অস্তু, বিশ্বাকর্মা বিমানের যুক্তি বের করেন। তারপর সেই বিমানের মধ্যে বসে আর্য লোকেরা এদিক-সেদিক ভ্রমণ করা শুরু করে।" (পূনা প্রবচন, পৃষ্ঠ ৯৪ তথা মহর্ষি দয়ানন্দ নির্বাণ শতী গ্রন্থ, ১৯৮৩)

"**বিশ্বকর্মা**" নামক মহান শিল্পীর উল্লেখ অনেক ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে এসেছে। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বেদ পড়ে সর্বপ্রথম বিমানের আবিষ্কার "**বিশ্বকর্মা**" কোটি-কোটি বছর পূর্বেই করেছিলেন।

মহাভারতে বিমান বিদ্যার সাক্ষ্য

দ্রুপদ মনে করছিলেন যে লাক্ষাগৃহে পাণ্ডব জ্বলে মরেনি। তিনি তার নিজের কন্যার বিবাহ অর্জুনের সঙ্গে করাতে চেয়েছিলেন (এছাড়া পরে দ্রৌপদীর বিবাহ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে হয়েছিল)। এইজন্য দ্রৌপদীর পিতা রাজা

দ্রুপদ স্বয়ম্বরের সূচনা এক এরকম ধরনের যন্ত্র (radar) দ্বারা দেন যেটি আকাশে ঘুরতো তাতে যদি পাণ্ডব কোথাও থাকে তবে সেই সংকেতকে শুনতে পারেন।

য়ন্ত্রম্ বৈহায়সম্ চাপি কারয়ামাস কৃত্রিমম্।
তেন য়ন্ত্রেণ সমিতম্ রাজা লক্ষ্যম্ চকার সঃ।।৮।।

(মহাভারত, আদি পর্ব ৩০|৮)

অর্থাৎ - "রাজা দ্রুপদ একটি কৃত্রিম আকাশ যন্ত্রও বানিয়েছেন যেটি তীব্র বেগে আকাশে ঘুরতে থাকতো। সেই যন্ত্রের ছিদ্রের উপর তিনি তারই সমান লক্ষ্য তৈরি করে রেখে দিয়ে ছিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পাতালে (আমেরিকাতে) অশ্বতরী অর্থাৎ যাকে অগ্নিয়ান নৌকা বলে সেটির উপর বসে পাতালে গিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞতে উদ্দালক ঋষিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তখন যুধিষ্ঠির জী শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে, **"ত্বত্কৃতে পৃথিবী সর্বা মদ্বশে কৃষ্ণ বর্ততে।"** হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার কৃপায় সম্পূর্ণ পৃথিবী আজ আমার অধীন হয়ে গেছে। মহাভারত সভাপর্বের এই শ্লোক স্পষ্ট সিদ্ধ করছে যে, সম্পূর্ণ বিশ্ব ভারতের সামনে, তার বল, বিদ্যা তথা সামর্থের সামনে নতমস্তক ছিল। এখানেই শেষ নয়, এটাও জানা যাচ্ছে যে, সম্পূর্ণ বিশ্বের মধ্যে বেদের জ্ঞাতা ঋষি মহর্ষি বসবাস করতো তথা ভ্রমণ আদি করতো। সুতরাং সম্পূর্ণ বিশ্বের মানুষ হল একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। সব মানুষ একে অপরের নিজের সম্বন্ধী। সকলকে একে অপরের ভালো তথা মানবীয় ক্রিয়াকলাপের সম্মান করা উচিত।

য়োগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের বিষয়ে তো আপনারা সকলে শুনেই থাকবেন। নিশ্চিত রূপে সেই শস্ত্র আজও লোকেদের আশ্চর্যের মধ্যে ফেলে দেয়।

ক্ষিপ্তম্ ক্ষিপ্তম্ রণে চৈতত্ ত্বয়া মাধব শত্রুশু।
হত্বাপ্রতিহতম্ সস্খ্যে পাণিমেষ্যতি তে পুনঃ।।

(মহাভারত, আদিপর্ব ৩৬|২৬)

শ্রীকৃষ্ণকে আগ্নেয়মস্ত্রম্ (সুদর্শন চক্র) দাতা মহান শিল্পী ব্রাহ্মণদেব বলছেন যে, হে মাধব! যুদ্ধে আপনি যখন-যখন এটিকে শত্রুর উপর চালাবেন, তখন-তখন এটি শীঘ্রই মেরে ফেলে আর স্বয়ং কোনো বজ্র দ্বারা নষ্ট না হয়ে পুনঃ আপনার হাতে চলে আসবে। (তীব্র গতিতে লক্ষ্য ভেদ করে বায়ুকে চিরে বিনা বিগড়ে পুনঃ প্রয়োগের জন্য ফিরে আসা আশ্চর্যজনক বিদ্যা ছিল। এই অস্ত্রের মহানতায় এতে বোঝা যায় যে, বর্তমান কালের পরম বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক এখন পর্যন্ত এরকম কোনো শস্ত্রের আবিষ্কার করতে পারেনি।) এইসব প্রমাণের পর এখন কে বলতে পারবে যে, আজ থেকে প্রায় ৫১৫৪ বছর পূর্বে মহাভারতের সময়ে বিমান বিদ্যা তথা অন্য উন্নত বিদ্যাগুলো ভারতে ছিল না। মহাভারত যুদ্ধে আমাদের সব জ্ঞান-বিজ্ঞান আর বৈভব নষ্ট হয়ে যায়। বিদ্বান তথা শিল্পী লোকেরা মরে যায়। কিন্তু মিত্রগণ, তার হাজার-হাজার বছর পরেও উদাহরণ স্বরূপে বেঁচে থাকা কিছু বিজ্ঞানের দিগ্দর্শন আপনাদের সম্মুখ করানো হবে।

• প্রশ্ন - মহাভারত যুদ্ধের পরে কি কখনও ভারতে বিমান আদি উড়ে ছিল?
• উত্তর - আজ থেকে প্রায় ১৫৫০ বছর পূর্বে ভারতের সম্রাট রাজা ভোজ ছিলেন। রাজা ভোজের সময়ে বিদ্বান, শিল্পীদের তথা লেখকদের বড় মান-সম্মান হত। মহাকবি কালিদাস তারই সময়ে হয়েছিল। তার প্রাচীন গ্রন্থ "ভোজপ্রবন্ধক" তথা "সমরাঙ্গণসূত্রধার" আমি স্বয়ং পড়েছি। তারমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেকগুলো বিদ্যা দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে মহর্ষি দয়ানন্দ জীও তাঁর পুস্তক **"সত্যার্থ প্রকাশের"** ১১তম সমুল্লাসের মধ্যে প্রাচীন বিমান বিদ্যার ঝলক দেখানোর সঙ্গে রাজা ভোজের প্রাচীন "**ভোজপ্রবন্ধক**" পুস্তক থেকে প্রমাণ দিয়ে লিখেছেন যে -

ঘট্যৈকয়া কোশদশৈকমশ্বঃ সুকৃত্রিমো গচ্ছতি চারুগত্যা।
বায়ুম্ দদাতি ব্যজনম্ সুপুষ্কলম্ বিনা মনুষ্যেণ চলত্যজস্ত্রম্।।

অর্থাৎ - রাজা ভোজের রাজ্যে এবং তৎসমীপবর্ত্তী স্থানে এমন বহু সুদক্ষ শিল্পী ছিল যে, তারা যন্ত্রকলাযুক্ত এক ঘোড়া আকারের যান নির্মাণ করেছিল। যেটি আধ ঘন্টার কম সময়ে ১১ কোশ এবং পূর্ণ এক ঘন্টায় ২৭.৫ কোশ পথ যেত। সেটি স্থল আর আন্তরিক্ষেও চলতো। তার এক ধরনের পাখা এরকম নির্মাণ করা হয়েছিল যে, সেটি বিনা মানুষে চালিত হয়েও কলাযন্ত্র বলে (force) সর্বদা চলতে থাকতো আর পুষ্কল বায়ু দিতে থাকতো। এই দুটো পদার্থই যদি আজ বিদ্যমান থাকতো তাহলে ইউরোপীয়রা এত অহংকারী হত না।"
এখানে ইউরোপীয় লোকেদের অপমান করার আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই আর না মহর্ষি দয়ানন্দের ছিল। কিন্তু প্রাচীন লোকেদের তাদের পুরুষার্থের এতটুকুও শ্রেয় না দিয়ে উল্টো তাদেরই অপমান করাটা কোনো সভ্য ব্যক্তিই সহ্য করবে না। আমি এখানে কেবল এটা বলতে চাই যে, বিশ্বে কখনও কোনো এক জাতিকে অন্য জাতির অপমান করা উচিত নয় আর না অন্যায় করে তার সাধন, সংসাধন, ধন সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে লুট করা উচিত। ভারত দেশকে সর্বপ্রকারে লুট করে তারপর তারই অপমান করা হয়েছে। মহান বৈজ্ঞানিকদের সন্তান ভারতের লোকেদের অশিক্ষিত, মূর্খ বলে ঈসাইরা কামানের মুখে বেঁধে হত্যা করতো। মুসলিমরা ভারতীয়দের মুখে থু ফেলে জজিয়া কর নিতো। যেই ভারতীয়দের পরিশ্রমে ৫৮ মুসলিম তথা ১০০ এর অধিক ঈসাই দেশ উন্নতি করেছে, সেই ভারতীয়দের নাশ করার চিন্তা করাটাই হল পশুবৃত্তি। যেরকম মা তার বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করায় আর তাকে প্রেমের সঙ্গে পালন করে, ভারত সর্বদা সারা বিশ্বকে কেবল দিয়েই গেছে, নেয়নি কিছুই। তারপরেও ঋষিদের ভূমি ভারত আর তার লোকেদের তথা তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, পরম্পরাগুলোকে তুচ্ছ বলে দেওয়া কতটা উচিত হবে?

ভারতে সৃষ্টির নিয়মের আধারে শত্রুদের যুদ্ধে হারানোর জন্য অনেক ধরনের দিব্য কলাযুক্ত যন্ত্রের নির্মাণ তথা প্রশিক্ষণের জন্য বেদের বিদ্যার আধারে "**ধনুর্বেদ**" বানানো হয়েছিল। এই গ্রন্থে উচ্চ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত উপস্থিত ছিল। আজ ধনুর্বেদ উপলব্ধ নেই।

১৮৫৭ সন্যাসী বিদ্রোহের মার্গদর্শক স্বামী দয়ানন্দ (গোল মুখওয়ালা বাবা) আর তাঁর গুরু বিরজানন্দ দন্ডীই ছিলেন। যখন ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে বাদ-বিবাদ, অনুশাসনহীনতা তথা অস্ত্র-শস্ত্রের অভাবের কারণে বিদ্রোহ অসফল হয়ে যায় তখন স্বামীজি অনেক দুঃখী হয়েছিলেন। এই কারণে উনি একবার বলেছিলেন যে- *"সারা ভারত ঘুরেও আমি ধনুর্বেদের আড়াই পৃষ্ঠাই পেয়েছি। যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে সম্পূর্ণ ধনুর্বেদ প্রকাশিত করবো।"* স্বামীজি এই একই কথা পুনঃ নভেম্বর ১৮৭৮ তে বলেছিলেন। (অজমের আর ঋষি দয়ানন্দ, পৃষ্ঠ ৬১ তথা দেশ ভক্তদের বলিদান, পৃষ্ঠ ৫০০)

দুর্ভাগ্যবশত, স্বামী দয়ানন্দ জী বেদের ভাষ্যও সম্পূর্ণ করতে পারেননি, তাঁকে ষড়যন্ত্র পূর্বক বিষ দিয়ে তাঁর শরীরকে সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল। আজ বিজ্ঞানও অনেক দিব্য শস্ত্রের বিস্তার করেছে। যেই রাষ্ট্রের কাছে যত উন্নত ধরনের অস্ত্র রয়েছে সেই রাষ্ট্রের তত অধিক ক্ষমতা রয়েছে। প্রাচীন ভারতেও দুষ্ট লোকেদের বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়ের জন্য অনেক প্রকারের শস্ত্রের নির্মাণ হয়েছিল। আপনাদের স্মরণে তো আছেই যে, যখন শ্রীরাম আর শ্রী লক্ষ্মণ জী একাই খর আর দূষণের ১৪০০০ সেনাকে কিছু সময়ের মধ্যেই দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

বেদের মধ্যে উড়োজাহাজ

মূলরূপে সারা বিশ্বে ছড়ানো সব বিদ্যাই বেদ থেকে ছড়িয়েছে। বেদের মধ্যে বিস্তারভাবে সমুদ্র, ভূমি আর অন্তরিক্ষে দ্রুত চলার জন্য যান বিদ্যার অনেক মন্ত্র রয়েছে। উড়োজাহাজ কিরকম হয়? উড়োজাহাজের গতি কত হয়? উড়োজাহাজ কিভাবে নির্মাণ করা হয়? এই বিষয়ে এত বিস্তারে বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে যে এর উপর একটি সম্পূর্ণ বিশাল গ্রন্থ লেখা যেতে পারে। এই বিষয়ের অধিক তথ্যের জন্য আপনি "**ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা**" পুস্তকের "**নৌবিমানাদিবিদ্যাবিষয়ঃ**"-টিও পড়তে পারেন।

সংক্ষেপে বেদের কয়েকটি মন্ত্র যেগুলোতে এই বিদ্যা বিস্তারভাবে দেওয়া হয়েছে -

১. যারা নৌকা দ্বারা সমুদ্রে, রথ দ্বারা ভূমিতে আর বিমান দ্বারা আকাশের মধ্যে দুষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তারা সর্বদা ঐশ্বর্য প্রাপ্ত করে থাকে। (ঋগ্বেদ ভাষ্য ১|১৬|৭)
২. যান এই প্রকারের হতে হবে যে যার দ্বারা একই দিবা-রাতের মধ্যে ভূগোল, সমুদ্র তথা অন্তরিক্ষ মার্গে তিনবার যাওয়া যেতে পারে। (ঋগ্বেদ ভাষ্য ১|৩৪|২)
৩. যান এই প্রকারের হতে হবে যে সেটির উপর বসে ১১ দিনের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে যাওয়া যেতে পারে। (ঋগ্বেদ ভাষ্য ১|৩৪|১১)
৪. যে রাজা শস্ত্রাস্ত্র জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ধার্মিক বীরদের, বিমান আদি যানের নির্মাতা শিল্পীদের আর বিদ্যুদাদি বিদ্যার বিদ্বানদের সৎকার-পূর্বক রক্ষা করে, তার খ্যাতি সূর্য-রশ্মির মতো ছড়ায়। (ঋগ্বেদ ভাষ্য ৬|২৯|২)
(যেরকম আমেরিকা, ইউরোপ আদি দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, সৈনিক, বিদ্বানরা অনেক ধন ও মান-সম্মান পেয়ে থাকে তাই সেসব দেশ আজ ঈশ্বরীয় জ্ঞানের কথা মানে তাই তারা এগিয়ে আছে।)

এখানেই শেষ নয়, বিমান নির্মাণের বিদ্যাও বেদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। বিমান কিভাবে নির্মাণ করতে হবে তার সম্বন্ধেও বেদের মধ্যে অনেক মন্ত্র রয়েছে। বিমান নির্মাণ করার বিদ্যা অনেক বেদ মন্ত্রের মধ্যে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যথা - ঋগ্বেদ ১|১৬৪|৪৮, ঋগ্বেদ ১|৩৪|২, ঋগ্বেদ ১|৩৪|৯ আদি আদি।

বাষ্পের ইঞ্জিন (স্টিম ইঞ্জিন)

সারা বিশ্ব বাষ্পের ইঞ্জিনের আবিষ্কারকে এই বৈজ্ঞানিক যুগের প্রারম্ভকারী বলে মনে করে। আপনি কি জানেন যে বাষ্প চালিত ইঞ্জিন নির্মাণের জ্ঞানটিও বেদের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের দিয়েছে? ঋগ্বেদ মণ্ডল ১, সূক্ত ৩৪, মন্ত্র সংখ্যা ১০ এর ভাবার্থে বাষ্প-নিঃসরণের জন্য যানের মধ্যে এক বিশেষ স্থান নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

"যখন যানের মধ্যে জল আর অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে জ্বালানো হয়, তখন এই যানটি স্থানান্তরে শীঘ্র প্রাপ্ত করবে। সেখানে জল আর বাষ্প বের করার এক এরকম স্থান করবে যেটি দিয়ে বাষ্প বের হতে বেগের (speed) বৃদ্ধি হবে।"

বাস্তবে, এই বিদ্যাটি এক সাধারণ সৃষ্টি নিয়মের আধারে কাজ করে আর সৃষ্টি নিয়মের জ্ঞান সর্বদা বেদের মধ্যে দেওয়া রয়েছে যারদ্বারা মানুষ বুদ্ধিপূর্বক অনেক প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পদার্থ নির্মাণ করে থাকে।

উড়োজাহাজ সম্বন্ধিত বেদের মন্ত্র

যজুর্বেদের ২১|৬, ৪|৩৪, ৩৩|৭৩ আদি অনেক মন্ত্রতে রয়েছে।
ঋগ্বেদ ১|৮৫|৪, ১|১১৭|১৫, ১|১১৬|৪, ৬|৬৩|৭, ১|৩৪|১২, ১|১৬৪|৩, ১|১০৮|১, ১|১০৪|১, ১|৩৪|৭, ১|১৮৪|৫, ১|১৬|৭, ৪|৪৫|৪, ১|৮৫|৭, ১|৮৭|২, ১|৮৮|১, ১|৯২|১৬, ১|১০৬|১, ১|১০৬|২, ১|১১২|১৩, ১|১১৬|৫, ১|১১৭|২, ১|১১৯|১, ১|১২০|১০, ১|১৪০|১২, ১|১৫৭|২, ১|১৬৩|৬, ১|১৬৭|২, ১|১৬৬|৫, ১|১৮১|৩, ১|১৮২|৫, ২|১৮|১, ২|১৮|৫, ২|৪০|৩, ৩|১৪|১, ৩|২৩|১, ৩|৪১|৯, ৩|৫৮|৩,৮,৯, ৪|১৭|১৪, ৪|৩১|১৪, ৪|৪৩|২, ৪|৪৫|৭, ৪|৪৬|৪, ৫|৫৬|৬, ৫|৬২|৪, ৫|৭৭|৩, ৬|৪৬|১১, ৬|৫৮|৩, ৬|৬০|১২, ৭|৩২|২৭ ইত্যাদি।

এরও অতিরিক্ত বেদের মধ্যে এই বিষয়ের তথা অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধিত সহস্র সহস্র মন্ত্র রয়েছে যেখানে সৃষ্টির প্রত্যেক নিয়ম তথা বিজ্ঞানকে সবিস্তারে বোঝানো হয়েছে।

বেদে বর্ণিত বিনা ইঞ্জিনের উড়োজাহাজ

এছাড়াও বেদের মধ্যে বিনা ইঞ্জিনের উড়োজাহাজ নির্মাণের বিষয়েও জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অণু শক্তি ও অন্য বৈকল্পিক উর্জার (energy) স্রোত দ্বারা বিমান উড়ানোর সংকেত দেওয়া হয়েছে। আজ বৈজ্ঞানিক এরই বিদ্যার বিস্তার করার জন্য লেগে রয়েছে। বেদে এক মন্ত্র এসেছে যে -

অনেনো বো মরুতো য়ামো অস্ত্বনশ্বশ্চিদ্যমজত্যরথীঃ।
অনবসো অনভীশূ রজস্তূর্বি রোদসী পথ্যা য়াতি সাধন্।।
(ঋগ্বেদ ৬|৬৬|৭)

শব্দার্থ - (মরুতঃ) হে মরুত! বীর সৈনিক! (বঃ) তোমার (য়ামঃ) যান, জাহাজ (অন্ এনঃ) নির্বিঘ্ন গতিকারী (অস্তু) হোক। তোমার সেই যান (রজঃ তূঃ) অণু শক্তি দ্বারা চালিত হোক (য়ম্) যা (অন্ অশ্বঃ) বিনা ঘোড়ার

(অরথীঃ) বিনা সারথীর (অনবসঃ) বিনা অন্ন, বিনা কাঠ, কয়লা অথবা পেট্রোল আদির (অন্ অভীশূঃ) বিনা রাসনের, বিনা লাগামেই (চিত্) (রোদসী) ভূমি আর আকাশে চলতে পারে, যেতে পারে (পথ্যা সাধন্) গতি বজায় রেখে মার্গে অনেক প্রকারের গতি আদি করতে পারে।

এত উন্নত বিমান নির্মাণের বিদ্যা বেদের মধ্যে দেখতে পেয়ে কিছু লোকের মহা আশ্চর্য হতে পারে যে বিশ্বের প্রাচীন পুস্তকটির মধ্যে এরকম বিদ্যা কিভাবে হতে পারে? যদি ইতিহাসকারদের মধ্যে এতটুকুও সততা বেঁচে থাকে তবে প্রাচীন বিশ্বের লোকেদের জংলী, মূর্খ, যাযাবর, সাপুড়ে আর রাখল বলা তথা লেখা বন্ধ করা উচিত। প্রাচীন লোক বেদাদি শাস্ত্রের বিদ্বান ছিলেন। বেদের মধ্যে সৃষ্টির সকল প্রকারের নিয়ম বলা হয়েছে। সুতরাং প্রাচীন লোকেরাও সব নিয়মের জ্ঞান সর্বদা জানতেন। তার থেকে তাঁরা অনেক ধরনের পদার্থও নির্মাণ করতেন। বর্তমান বিজ্ঞান এখানে পর্যন্ত এসেছে কারণ প্রাচীন লোকেরা অনেক পুরুষার্থ করে গণিত আদি বিদ্যাকে বেদ দ্বারা উন্নত করেছিলেন। সুতরাং সংসারের লোকেদের প্রাচীন আর্যদের ঋণী হওয়া উচিত তথা বিজ্ঞানের এই উন্নতির শ্রেয় তাঁদের অবশ্যই দেওয়া উচিত। যদি আমরা এরকমটা না করি তবে নিশ্চিত রূপে আমরা কৃতঘ্ন হবো।

পুষ্পক বিমান - রামায়ণে বিমান বিদ্যা

রামায়ণে কুবেরের পুষ্পক বিমানের উল্লেখ অনেক স্থানে এসেছে। কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাবণ পুষ্পক বিমানটি জিতেছিল। এখন কিছু লোক বলছে যে, কেবল একটা বিমানেরই স্পষ্ট বর্ণন এসেছে, এরজন্য বিমান বিদ্যা ছিল না। এরকম লোকেদের পঙ্গু বুদ্ধির উপর দুঃখ আসে। যেই কুবেরের কাছে পুষ্পকের মতো বিমান ছিল, রাবণ কি পারতো বিনা বায়ুসেনায় তার সঙ্গে যুদ্ধে জিততে?
অস্তু, সেই সময় বিশ্বের সবথেকে উত্তম, সবথেকে সুন্দর, শীঘ্রগামী, স্বর্ণময় তথা প্রসিদ্ধ পুষ্পক বিমানই ছিল। এইজন্য তার বর্ণন এসেছে। সেসময় উড়োজাহাজের বিদ্যা সামান্য ছিল, তাই সামান্য কথার বারংবার উল্লেখ হয় না। তবুও রামায়ণে অনেক স্থানে উড়োজাহাজের বিদ্যার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।
যখন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পরে ছিলেন তখন রাবণ রাক্ষসীদের বলে যে, যাও সীতাকে পুষ্পক বিমানে বসিয়ে মৃত রাম-লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়ে নিয়ে আসো।

বিমানম্ পুষ্পকম্ তত্তু সন্নিবর্ত্যেম্ মনোজবম্।
দীনা ত্রিজটয়া সীতা লঙ্কামেব প্রবেশিতা।।

(বাল্মীকি রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ২৮|২০)

রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়ে ত্রিজটা রাক্ষসী মনের সমান দ্রুতগামী পুষ্পক বিমানকে ফিরিয়ে দুঃখী সীতাকে লঙ্কাতে নিয়ে আসলো।

এই প্রকার যুদ্ধ সমাপ্তির পরে লঙ্কারাজ বিভীষণ শ্রীরামের প্রস্থানের জন্য পুষ্পক বিমানকে প্রস্তুত করেছিলেন-

ক্ষিপ্রমারোহ সুগ্রীব বিমানম্ বানরৈঃ সহ।
ত্বমপ্যারোহ সামাত্যো রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ॥

(বাল্মীকি রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ৬৮|২০)

শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে বানর সহিত বিভীষণ আদিও পুষ্পক বিমানে বসে অযোধ্যায় শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকে যান।

ভাবুন, বিমানটি কত বড় হবে! অযোধ্যাতে যাওয়ার সময় পুষ্পক বিমান দ্বারা অনেক স্থানের নিরীক্ষণও সকলে করেছিল যাকে আজকাল হাওয়াই নিরীক্ষণও বলা হয়।

সুগ্রীবেণৈবমুক্তস্তু হৃষ্টো দধিমুখঃ কপিঃ।
স প্রণম্য তান্ সর্বান্ দিবমেবোৎপপাত হ॥

(বাল্মীকি রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড ৪০|১)

সুন্দরকাণ্ডে সুগ্রীব তার নিজের বনরক্ষক দধিমুখকে বলেন যে, এখন আপনি গিয়ে পূর্ববনের রক্ষা করুন। আর হনুমান আদি সৈনিকদের শীঘ্রই এখানে পাঠিয়ে দিন। সুগ্রীবের এরকম বলার পর দধিমুখ প্রসন্নতাপূর্বক **"আকাশ মার্গ"** দ্বারা চলে যায়।

এতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, না কেবল পুষ্পক বিমান বরং রামায়ণে আকাশ মার্গ দ্বারা যাওয়ার জন্য অনেক ব্যক্তিদের কাছে নিজের নিজের উড়োজাহাজ ছিল। এখানে আমি কেবল সংক্ষেপেই এর প্রতিপাদন করেছি। বুদ্ধিমান অল্পতেই অধিক জেনে নিবে।

ভারতে উড়োজাহাজের অনেকগুলো উদাহরণ

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ "গয়াচিন্তামণি" তে মোর (ময়ূর) আকৃতির বিমান নির্মাণের বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে শাল্বের বিমান তো ভূমি, আকাশ, জল, পাহাড়ে সহজেই চলতে পারতো।

সলব্ধ্বা কামগম্ য়ানম্ তমোধাম দুরাসদম্।
য়য়ৌ দ্বারবতীম্ শাল্বো বৈরম্ বৃষ্ণীকৃতম্ স্মরন্॥

ক্বচিদ্ ভূমৌ ক্বচিদ্ ব্যোম্নি গিরিশৃঙ্গে জলে ক্বচিদ্।

অভিজ্ঞান শাকুন্তলেও উড়োজাহাজ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আর রাজর্ষি দুষ্যন্তের প্রয়োগ ভাসিত হয়েছে। বিমানের শিল্পী কেবল বৌদ্ধকাল পর্যন্তই নয় বরং রাজা ভোজের কাল পর্যন্তও ছিল, এই কথাটি আমার লেখার প্রমাণগুলো দ্বারা আপনারা বুঝেই গিয়েছেন।

পুত্র দারমরুস সকুনস্য কুচ্ছিয়ম্ নিসিদার্য়ত্বা।
বাতপাতেন নিক্কনিত্বা প্লানি।।

(ধম্মপাদ - বোধিরাজ কুমার বত্থু)

এই শ্লোকে লেখা আছে যে, বোধিরাজ কুমারের মহলের কারাগার থেকে এক কারিগর বিমান নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ভারতের অনেক ইতিহাসের গ্রন্থে বিমান বিদ্যার ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। সেই বিজ্ঞানের আধারে ধীরে-ধীরে বিজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। মধ্যকালীন বিশ্বের পরিস্থিতি কিছু অনুকূল না হওয়ার কারণে মাঝপথে বিজ্ঞানে মেঘ ছেয়ে যায় কিন্তু ৪০০-৫০০ বছর পূর্বে সেই মেঘ পুনঃ সরে যায় আর বিজ্ঞানে বল আসে। এই কারণে আজ বিজ্ঞান উন্নত অবস্থায় এসেছে। এই বিজ্ঞানকে এখানে পর্যন্ত পৌঁছাতে যে যে মহাত্মাগণের অবদান রয়েছে সেসবের প্রতি মানব জাতি সর্বদা ঋণী থাকবে। আমি অনেকবার দেখেছি যে, প্রাচীন বৈদিক বিমান বিদ্যার উপর অন্যদের তুলনায় আগে নিজেদের লোকেরাই প্রশ্ন তুলে বসে। কিছু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক প্রতিশোধের ভাবনায় ভরা থাকে। এখন বৌদ্ধগ্রন্থের উদাহরণ দিয়ে আমি প্রাচীন উড়োজাহাজ শিল্প সিদ্ধ করে দিয়েছি। আশা করি সকল ভারতীয় নিজের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা, সংস্কৃতি আর পরম্পরার সম্মান করার সঙ্গে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বিশ্বের সন্মুখ উঠে দাঁড়াবে।

বিমান শাস্ত্র

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দীর্ঘ গুলামী তথা শত্রুভাব দ্বারা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের যথাসম্ভব বিনাশ করা হয়েছে। এই কারণে বিমান বিষয়ের উপর বিস্তার তথ্য প্রদানকারী সাহিত্য লুপ্তপ্রায় হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে একটি গ্রন্থ মহর্ষি ভারতদ্বাজকৃত "বৃহদ্বিমানশাস্ত্র" গ্রন্থের প্রাচীন প্রতি আমার হাতে আসে। একটি প্রতি বডৌদা রাজকীয় পুস্তকালয়ের মধ্যেও রয়েছে কারণ এই পুস্তকালয় দ্বারা সহায়তা আদি নিয়ে দিল্লি সরকারের সংস্কৃত একাডেমী এই গ্রন্থের সংস্কৃতে প্রকাশন করার পরিকল্পনা তৈরি করছে। অস্তু, যাই হোক এই গ্রন্থের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ ও উন্নত প্রকারের বিমানবিদ্যার প্রতিপাদন করা হয়েছে।

প্রায় ২৫ বছর পূর্বে ব্যাঙ্গালোরের Institute of Science এর বিমান বিভাগ (Aeronautics Division) এর পাঁচ বিদ্বান সংশোধকের (Research Scholars) লেখা পত্র মাদ্রাজের আঙ্গল দৈনিক The Hindu তে

প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পত্রে তারা লিখেছিল যে, *"ভরদ্বাজ মুনি দ্বারা লিখিত "**বৃহদ্বিমানশাস্ত্র**" পুস্তকের মধ্যে বর্ণিত বিবিধ বিমানগুলোর মধ্যে "রুক্মি" প্রকারের বিমানের উড়ান বিধিটি বুঝতে পারা যায়। সেই বিধিতে আজও উড়ানো যেতে পারে। কিন্তু অন্য বিমানগুলো বিস্তারিতভাবে বোঝা যাচ্ছে না।"*
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের শব্দ, পরিভাষা তথা সিদ্ধান্তগুলোকে আজ বুঝতে খুবই দূর্লভ হবে। এর স্পষ্ট কারণ হয় যে, শত শত বছর ধরে সেই গ্রন্থগুলোর অনুসন্ধান করা হয়নি আর না সেই বিদ্যার অভ্যাস করা হয়েছে। কিন্তু তবুও বর্তমান কালেও ১৮৯৫ তে এরকম গ্রন্থ পড়ে একজন ভারতীয়ই বিমান নির্মাণের ভিত্তি রেখেছিলেন। বিমানশাস্ত্র পুস্তকটি Thanks Bharat এর সঙ্গে সম্পর্ক করে প্রাপ্ত করতে পারবেন। (https://www.thanksbharat.com/.../viman-shastra-online-pdf...)

শিবকর বাপুজী তলপাডে

অনেক লোকেই জিজ্ঞেস করে থাকে যে, শিবকর বাপুজী তলপাডের বিষয়ে যা কিছু কমবেশি বলা হয়েছে সেসব কি সত্য নাকি মিথ্যা? আমি মনে করি শিবকর বাপুজী তলপাডে ইতিহাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে খুবই কম তথ্য উপলব্ধ রয়েছে। এই মহান ব্যক্তির উপর একটি ফিল্মও হয়েছিল যার নাম "হাওয়াইজাদা" ছিল। যদিও ফিল্মটিকে রুচিকর বানানোর জন্য সংস্কৃতের পণ্ডিত, আর্য সমাজ কাকডবাড়ীর সদস্য শিবকর বাপুজী তলপাডেকে ভুল রূপে প্রদর্শিত করা হয়েছিল। অস্তু, এখন তো সারা বিশ্বের মিডিয়াতে এই বিষয় যে "বিমান আবিষ্কার কি এক ভারতীয় করেছিল?" এসে গেছে।

শিবকর বাপুজী তলপাডে বিমান নির্মাণের প্রয়োগশালা মহর্ষি দয়ানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৮৮২ সালে খুলে ছিলেন। মহর্ষি দয়ানন্দের বেদ ভাষ্যকে পড়ে তথা ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকাকে পড়ে তিনি প্রথম বিমানের মডেল তৈরি করেন আর বিশ্বের প্রথম বিমানটি ১৮৯৫ সালে মুম্বাইয়ের জুহু বিজে উড়িয়ে ছিলেন। এটা কিভাবে হতে পারে যে এরকম ব্যক্তি কোনো পুস্তক, নিবন্ধ অথবা নিজের অনুসন্ধানের কোনো মডেল না রেখে চলে যাবেন? নিশ্চই শিবকর বাপুজী তলপাডের কাছে ইংরেজরা বিমানকে উন্নত বানানোর জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বাহানায় মডেলটি হাতিয়ে নিয়ে থাকবে। সেখান থেকেই বিমান নির্মাণের কাজে লেগে থাকা রাইট ব্রাদার্সরা সেই ডকুমেন্ট (দলিল) পেয়ে যায় তথা আবিষ্কারের শ্রেয় তাদেরকেই দিয়ে

দেওয়া হয়। পরবর্তীতে অনেক লুট করা ধনের ক্ষমতায় ইউরোপীয়রা বড় বড় বিমান নির্মাণ করে আর আর্য শিবকর বাপুজী তলপাডেকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় শিবকর বাপুজী অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে শিবকর জী সুব্রহ্মণ্যয়ম শাস্ত্রীর কাছে "বৃহদ্বিমানশাস্ত্র" কে বোঝার জন্য সহায়তা নেন। শিবকর জী ১৯১৫-১৯১৭ পর্যন্ত "মরুত্শিখা" নামক বিমানের উপর কাজ করছিলেন। এবারের বার তিনি এক এরকম অতি উন্নত বিমান নির্মাণের বিচার করছিলেন যে যেন সেটিকে জানতে পেরে বিশ্বের লোকেরা মিথ্যাবাদী আবিষ্কারক রাইট ব্রাদার্সকে ভুলে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।

কিছু আর্য সমাজের বিদ্বানরা মনে করেন যে, তিনি বিমান নির্মাণের খুবই নিকটে ছিলেন ও তাঁর মৃত্যুর পিছনেও কোনো ষড়যন্ত্র ছিল। কেবল আর্য সমাজিদের ছাড়া সকল হিন্দুরাই এই বিষয়ে চুপ করে আছে কারণ তারা মনে করে যে শিবকর বাপুজী একজন আর্য সমাজী ছিলেন আর তাঁর নাম নিলে আর্য সমাজের প্রচার হবে। এই নিম্ন মানসিকতা থেকে বাইরে বেরিয়ে আমাদের এরকম সময়ে একজন ভারতীয় হয়ে ভাবা উচিত। ভারতের আত্মমর্যাদাকে জাগানোর দায়িত্ব কি কেবল শিবকর বাপুজী তলপাডেরই ছিল? এই দায়িত্ব কি আমাদের সকলের নয়?

উড়োজাহাজের ইতিহাসের সারমর্ম

ব্রিটেনের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী "লর্ড পর্মস্টন" ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮ তে ব্রিটিশ লোকসদনে বলেছেন যে, *"যখন আর্যাবর্তে সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার নিজের শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল, তখন ইউরোপীয়রা নিতান্ত জংলী ছিল।"*

এতে কোনো সংশয় নেই যে মানুষ সর্বপ্রথম ভারত দেশের মধ্যেই বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অরুণোদয় দেখে। যত ধরনের বিদ্যা আদি ভূগোলে ছড়িয়ে রয়েছে তার পিছনে আর্য প্রজাতি ও আর্য সংস্কৃতিই রয়েছে। আশা করি আপনাদের এই লেখাটি ভালো লেগেছে, আত্মমর্যাদাকে জাগিয়ে তুলতে আর প্রমাণিক লেগেছে। আমি মনে করি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক ভারতীয় স্বয়ং অধ্যয়ন করা শুরু করবে ততক্ষন পর্যন্ত কোনো লাভ হবে না। ১০-১২ লোক দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। লক্ষ-লক্ষ লোককে তাদের যোগ্যতা বাড়াতে

হবে। তারপর সকল যোগ্যতম লোকেদের ময়দানে নামতে হবে। যখন লক্ষ-লক্ষ স্বাধ্যায়কারী, যোগ্য, জ্ঞানবান লোকেরা এক সঙ্গে কাজে লাগবেন তখন কিছু সময়ের মধ্যেই পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাবে আর দেখতে দেখতেই সম্পূর্ণ দেশ বদলে যাবে। এই পুস্তক প্রত্যেক যুবকের যোগ্যতা তথা জ্ঞানকে কয়েকগুণ বাড়াতে সক্ষম হবে। সুতরাং সকল যোগ্য নবযুবকদের এই পুস্তকটি পড়ার জন্য প্রেরিত করবেন।

[**सर्वश्रेष्ठ कौन**? (সর্বশ্রেষ্ঠ কে?) গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত]

লেখক - রাহুল আর্য

সম্পূর্ণ পুস্তকটি পড়তে হলে নিচে দেওয়া Link থেকে পুস্তকটি সংগ্রহ করতে পারবেন -
www.thanksbharat.com/products/dharma-itihaas

অনুবাদক - আশীষ আর্য
www.facebook.com/SatyaSanatanVaidicDharma

আর্থিক সহায়তা জন্য -

Name	Thanks Bharat Trust
Account No.	50200045841499
IFSCODE	HDFC0000325
Branch	HDFC Bank, Bahadurgarh, Haryana
PhonePe/GooglePay	7015123619
Paypal	paypal.me/thanksbharat
UPI	thanksbharat@upi

Scan QR to contribute

Thanks Bharat

thanksbharat@upi